তিন গোয়েন্দা

কিশোর জাদুকর

রকিব হাসান

টম জুবের।

রকি বীচে নতুন।

ওর বাবা মার্ক জুবের একজন ম্যাজিশিয়ান।

মা ঝাড়ফুঁক করে মানুষের রোগ সারায়।

টম নিজেও খুদে ম্যাজিশিয়ান।

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইল।

কিন্তু সন্দেহ জাগল কিশোরের:

এত আগ্রহ কেন?

চোখের সামনে ওর

হাতঘড়িটা উধাও করে দিল টম।

'তিন গোয়েন্দা'কে ধরেও টান দেবে নাকি!

গায়েব করে দেয়ার ইচ্ছে?

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro

facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

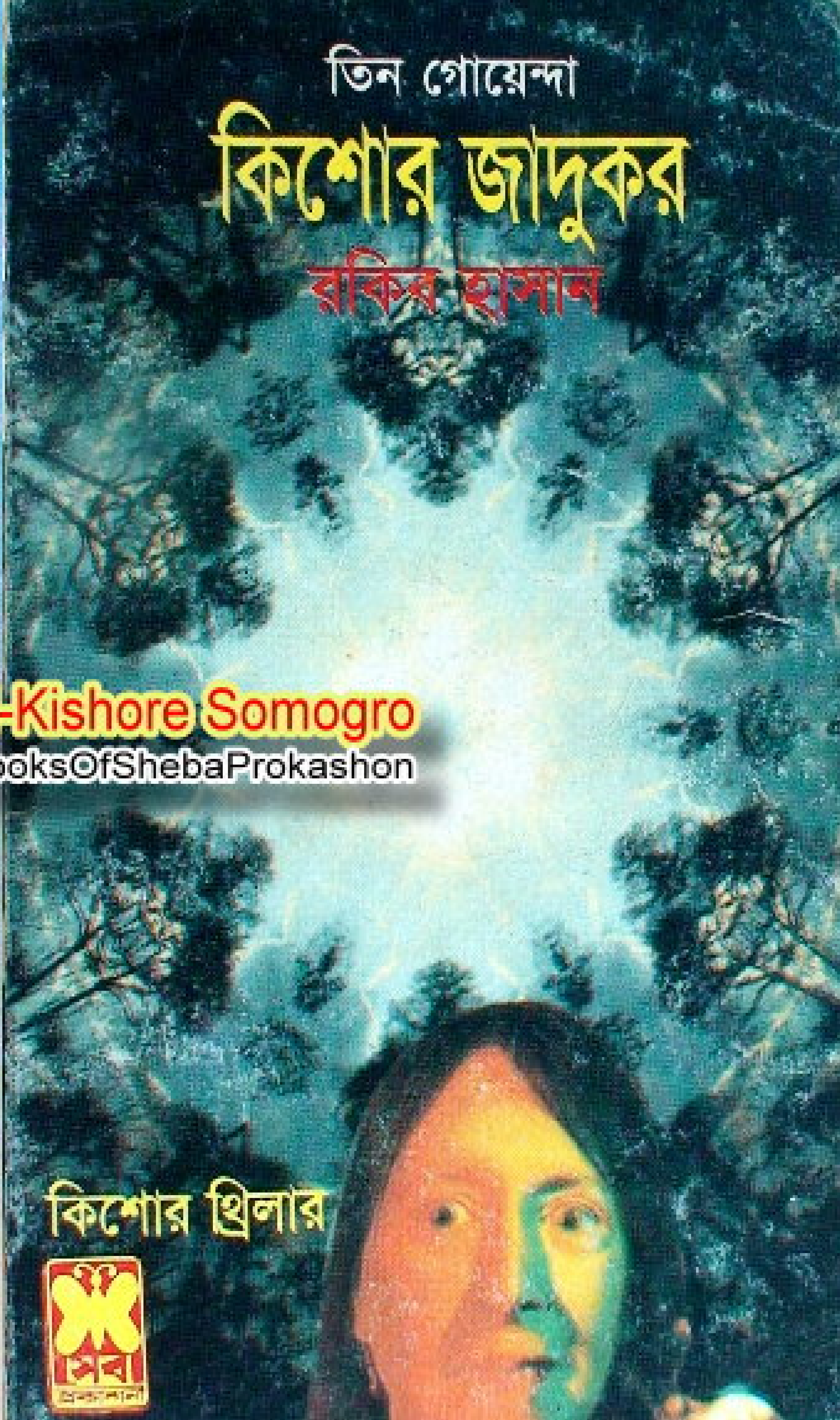

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

কিশোর জাদুকর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

'রবিন এত দেরি করছে কেন,' মুসা বলল, 'কি হলো ওর?'

ঘড়ি দেখল কিশোর, 'মাত্র তো পনেরো মিনিট। কি আর হবে?'

উজ্জ্বল রোদ। চমৎকার দিন। পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে রবিনের জন্যে অপেক্ষা করছে দু'জনে।

'এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না আমার। গেল কোথায় ও?' গলা লম্বা করে রাস্তার দিকে তাকাল মুসা। রবিন আসছে কিনা দেখছে।

'আর পাঁচ মিনিট দেখব।'

'না এলে সোজা বাড়ি চলে যাব আমি। খিদেয় পেট জ্বলছে।' চারপাশে তাকিয়ে বসার কোন জায়গা না পেয়ে দেয়ালে হেলান দিল মুসা। 'খিদেয় আমার গা কাঁপছে।'

'সব সময়ই তো খিদেয় তোমার গা কাঁপে। কাঁপুক। বাড়ি যেতে পারবে না। একটা হপ্তা ধরে লাইব্রেরিতে যাব যাব করে যাওয়া হচ্ছে না। এ নেই তো ও নেই...ফেসটিভ্যালে যাওয়ার ইচ্ছে নেই নাকি তোমার?'

বার্ষিক রকি বীচ ফেসটিভ্যালে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ বছর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উৎসব পালনের চিন্তাভাবনা করছে শহরবাসী। পুরানো আমলে কিভাবে এ উৎসব পালন করা হত এখানে, সেটা জানার জন্যে লাইব্রেরিতে যেতে চাইছে ওরা। ওদের স্কুল থেকে ব্যতিক্রমী কিছু করার কথা ভাবছে কিশোর।

'ওই যে আসছে,' সোজা হয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'সঙ্গের ছেলেটা কে?'

ছেলেটার কালো চুল। রবিনের চেয়ে দু'এক ইঞ্চি লম্বা। অ্যাথলেটদের মত স্বাস্থ্য। লম্বাটে, চোখা মুখ।

'কে ও?'

'চিনি না...না না, মনে পড়েছে, ওটা ওই নতুন ছেলেটা। কি যেন নাম?...আমাদের এক ক্লাস ওপরে পড়ে। টম জুবের।'

'ও, তাই তো,' মুসাও চিনতে পারল। জুবেররা রকি বীচে নতুন, কয়েক হপ্তা আগে এসেছে। 'ওর বাবা-মাকে নিয়ে লোকে নানা কথা বলছে, শুনেছ? কাল মা মার্কেট থেকে শুনে এল।'

'কি শুনেছেন?' বিশেষ আগ্রহ দেখাল না কিশোর।

'ওর মা নাকি ঝাড়ফুঁক করে জটিল রোগ সারাতে পারে। ওর বাবা ম্যাজিশিয়ান। ম্যানার স্ট্রীটে একটা দোকান নিয়েছে ওরা...অ্যাই, রবিন, অনেক

দেরি করে ফেললে।'

কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। পেছনে টম।

'টমকে নিয়ে এলাম,' রবিন বলল, 'ও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিল। টম, ও কিশোর। তোমার মতই বুদ্ধি...'

'বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আজকাল,' আফসোস করে বলল মুসা। 'দুনিয়ায় কেবল আমিই বোকা রয়ে গেলাম।'

'ও মুসা,' হেসে টমকে বলল রবিন। 'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না। ও এভাবেই কথা বলে।'

'না না, মনে করব কি,' হেসে বলল টম। মুসা আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলাম, তোমরা শখের গোয়েন্দা। অনেক রহস্যের সমাধান করেছ। ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'ইনটারেস্টিং তো বটেই,' মুখ বাঁকাল মুসা। 'মাঝে মাঝে আল্লার দেয়া জানটা খোয়ানো বাকি থাকে আরকি!'

মুসার কথায় কান না দিয়ে টমকে বলল কিশোর, 'রহস্যের সমাধান করতে আমাদের ভাল লাগে।'

'কিশোর,' রবিন বলল, 'টমকে বললাম, কেরির সঙ্গে কথা বলতে। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে ম্যাজিকের ওপর একটা কলাম লিখতে পারে টম। দারুণ জনপ্রিয়তা পাবে।'

কেরি জনসন সবচেয়ে ওপরের ক্লাসে পড়ে। স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা।

'তা মন্দ হয় না।' টমের দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি ম্যাজিক জানো নাকি?'

'অল্পস্বল্প। আব্বার কাছে শিখেছি।'

'অতি বিনয়।' মুসা আর কিশোরের দিকে ফিরল রবিন, 'খুব ভাল ম্যাজিক জানে ও। ঘড়ি উধাও করে দেয়ার ম্যাজিকটা তো অসাধারণ। এই টম, দেখাও না ওদের।'

'বেশ,' হাত বাড়াল টম, 'একটা ঘড়ি দেবে?'

'আমারটার দিকে চেয়ে লাভ নেই,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, 'অনেক দাম। কিছু হলে মা আমাকে খুন করে ফেলবে।'

আস্তে করে নিজের ঘড়িটা খুলে টমের তালুতে রেখে দিল কিশোর। 'কোনখান থেকে এসেছ তোমরা?'

'রিভারসাইড কাউন্টি,' একটা রুমাল বের করে ঘড়িটা জড়িয়ে নিল টম।

'রিভারসাইড কাউন্টির কোথায়? গেছি আমি ওখানে। চিনতে পারি।'

'চিনবে না। ইয়েলো লীফের একটা সরু গলি। থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল আমার আব্বা-আম্মা। শেষে ভাবল, অনেক হয়েছে, আর না, এবার বেরোনো যাক। পালিয়ে এল রকি বীচে।'

'পালিয়ে এল বলছ কেন?'

'থাকতে মন চায়নি। পালিয়েই তো এসেছে।'

'হুঁ।'

'এখানে মনে হয় ভালই থাকা যাবে, দোকানটা যদি চলে। ইনকাম মন্দ হবে না। কি বলো?'

'কিসের দোকান?'

'ম্যাজিক দেখানোর জিনিসপত্র। ভেষজ ওষুধ। তা ছাড়া হোলফুড-এই যে আজকাল স্বাস্থ্য সচেতন লোকেরা খাওয়া শুরু করেছে। আরও নানা রকম জিনিস। দেখলেই বুঝবে। যাবে নাকি?'

'আমার তো এক্ষুণি যেতে ইচ্ছে করছে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা, 'এ শহরটায় তো ম্যাজিক আর খাবারের আকাল পড়েছে আজকাল।'

রুমালে মোড়া ঘড়িটা ফুটপাথে রাখল টম। 'সরো। সরে যাও। মন্ত্র পড়ব।'

সরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

দুই হাত সামনে বাড়িয়ে চোখ আধবোজা করে, একঘেয়ে কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল টম, 'হোকাস-পোকাস, সব বোগাস, ঘড়ি ফুটুস-ঠুস্স্! লাগ ভেলকি লাগ! কিশোরের ঘড়ি ভাগ!...ব্যস, চলে গেছে।'

রুমালের পুঁটলিটার দিকে তাকাল মুসা। 'ওর মধ্যে ছিলই না। আগেই তুমি তোমার শার্টের হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছ।'

'তাহলে দেখো আমার দেহতল্লাশি করে,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল টম।

রুমালটা তোলার জন্যে নিচু হলো কিশোর।

বাধা দিল টম, 'এক সেকেন্ড।'

কেউ কিছু বোঝার আগেই পা তুলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল রুমালটা, ভেতরে কিছু থাকলে ভর্তা হয়ে যাবে। কড়মড় করে শব্দ হলো। হাঁ হয়ে গেল কিশোরের মুখ।

'হায় হায়,' চমকে গেল টম, 'মন্ত্রে কাজ হয়নি!'

'আমার ঘড়ি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

মুখ কালো করে রুমালটা তুলে নিয়ে খুলতে শুরু করল টম। বেরোল ঘড়ির ভাঙা কাঁচের টুকরো আর যন্ত্রপাতি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে টম বলল, 'মন্ত্রে কাজ তো হয়েছে এতদিন, আজ এমন হলো কেন!'

নির্বাক হয়ে গেছে কিশোর।

ভাঙা টুকরোগুলো সহ রুমালটাকে হাতের তালুতে দলামোচড়া করে টম বলল, 'ঠিক আছে, দাম দিয়ে দিচ্ছি। কত?'

'দাম দিয়ে কি করব আমি?' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'চাচী আর আস্ত রাখবে না আমাকে। গত জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল।'

পকেট থেকে পেটমোটা একটা মানিব্যাগ বের করল টম। 'ঠিক আছে, নতুন আরেকটা ঘড়ির দামই নাহয় দিচ্ছি। এক রকম দেখে কিনে নিও। তোমার চাচী বুঝতে পারবে না।'

'কিন্তু ওটা ছিল উপহার...নতুন আরেকটা কিনলেও সেটার আর উপহারের মূল্য থাকবে না...' থেমে গেল কিশোর। পেটমোটা ব্যাগ খুলে একটা ঘড়ি

টেনে বের করছে টম। দুই আঙুলে ফিতের মাথা টিপে ধরে উঁচু করল ঘড়িটা।
শব্দ করে হেসে উঠল রবিন।
'ওটার বদলে তাহলে এটা নাও,' কিশোরের নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে বলল টম। 'চলবে এতে?'
কিশোর দেখল, ওর নিজের ঘড়িটাই। সামান্যতম দাগও পড়েনি কোথাও।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা। 'খুব একচোট নিল তোমাকে ও। রবিন ঠিকই বলেছে, বুদ্ধি আছে। আমি বলেছি না, রুমালের মধ্যে তোমার ঘড়িটা ছিলই না। আগেই সরিয়ে ফেলেছে। ভাল হাতসাফাই।'
ঘড়িটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে ভুরু নাচাল কিশোর, 'কি করে করলে?'
'ম্যাজিক,' হাসিমুখে জবাব দিল টম।

দুই

ঘড়িটা কব্জিতে পরে নিল কিশোর। হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু স্বাভাবিক হাসি ফুটল না। ধোঁকা খাওয়ার কথাটা ভুলতে পারছে না। নিজের ওপরই বিরক্ত।
'বলেছি না খুব ভাল ম্যাজিক জানে টম,' রবিন বলল। 'খুবই ভাল, তাই না?'
'হ্যাঁ, সত্যি চালাক,' টমের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল কিশোর। 'তবে ওই একবারই। আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।' অস্বস্তির ভঙ্গিটা ধীরে ধীরে কেটে গেল চেহারা থেকে। 'যাকগে, ভালই বোকা বানিয়েছ।'
'আরও অনেক রকম ম্যাজিক জানে ও,' রবিন বলল।
'আর আধঘন্টার মধ্যেই কিন্তু লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'নাকি আজও যাওয়া বন্ধ?'
'না না, যাব,' কিশোর বলল। 'মাত্র আছে আর দুই হপ্তা। আজ না গেলে হবে না।'
'ঠিক আছে, যাও তোমরা,' রবিন বলল। 'আমি টমের সঙ্গে এক জায়গায় যাচ্ছি। একটা মজার জিনিস দেখাবে বলেছে টম। পরে বলব তোমাদের।'
রাস্তা পার হয়ে চলে গেল দু'জনে। তাকিয়ে রইল মুসা আর কিশোর।
'লাইব্রেরিতে যেতে রবিনের অনীহা!' বিড়বিড় করল মুসা। 'স্বপ্ন দেখছি না তো?'
'না, ঠিকই দেখছ,' শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর। 'নিশ্চয় লাইব্রেরির চেয়েও মজার কোন কিছুর খোঁজ দিয়েছে ওকে টম। ছেলেটা কেমন যেন…ওদের রিভারসাইড কাউন্টিতে বাস করার ব্যাপারটাও।'
'ওতে আবার কি দেখলে? রিভারসাইড কাউন্টিতে থাকে না নাকি মানুষ।'

'থাকে। কিন্তু ও বলল ইয়েলো লীফের একটা সরু গলিতে থাকত ওরা। ইয়েলো লীফটা রিভারসাইড কাউন্টিতে নয়, ওরিংটনে। ওটা একটা অতিমাত্রায় সম্ভ্রান্ত এলাকা। ওরকম জায়গায় কেবল বড় বড় কোটিপতিরাই থাকতে পারে।'

'হয়তো ওরা কোটিপতিই।'

'কোটিপতি? বাবা দেখায় ম্যাজিক, মা করে ঝাড়ফুঁক; এ সব করে ক'টাকা পায়? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'হয়তো ওর বাবা অনেক বড় ম্যাজিশিয়ান। কিংবা বাড়িয়ে বলে আমাদের চমকে দেয়ার চেষ্টা করেছে টম। এটা নিয়ে এত ভাবার কি হলো?'

'অদ্ভুত লাগছে আরকি।'

লাইব্রেরির দিকে এগোল দু'জনে।

'ঘড়িটা কি করে উধাও করেছে আমি বুঝে গেছি,' মুসা বলল। 'দাও দেখি তোমার ঘড়িটা, একবার চেষ্টা করে দেখি।'

'জীবনেও কাউকে দেব না আর। তোমার ওই বিশাল পা'টা তুলে দিলে ঘড়ি বলেই চেনা যাবে না আর। কি বাঁচাটাই না বেঁচেছি, চাচীর বকা থেকে। আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করে আমাকে ভড়কে দিয়েছে ও।'

লাইব্রেরিতে ঢুকল ওরা। ডেস্কে রাখা একটা কম্পিউটারের সামনে বসল কিশোর। দ্রুতহাতে চাবি টিপতে আরম্ভ করল।

'কি খুঁজছ?' জানতে চাইল মুসা।

'এফ ফর ফকলোর।'

দ্রুত একসারি সবুজ লেখা ফুটল স্ক্রীনে। দেখতে দেখতে বলে উঠল কিশোর, 'পেয়েছি।' উঠে দাঁড়াল সে, 'এসো।'

তাক থেকে মোটা মোটা আধডজন বই নামিয়ে আনল দু'জনে। ডেস্কে রেখে ওল্টাতে শুরু করল কিশোর। মুসা তাকিয়ে রইল। বই ঘাঁটাঘাঁটি ভাল লাগে না ওর।

'ঠিক জায়গাতেই খুঁজছি,' কিশোর বলল। 'বহু জিনিস আছে এখানে। কিছু না কিছু পেয়েই যাব।'

পাশের টেবিলে বসা দু'জন মহিলা কথা বলছে। কানে আসছে মুসার।

'এ নিয়ে গত পনেরো দিনে দু' দুটো বড় চুরির ঘটনা ঘটল,' একজন বলছে। 'এ রকম তো ছিল না আমাদের রকি বীচ। রাতে দরজা-জানালা খুলেও শুয়ে থাকতাম। এখন তো ঘুমই হারাম করে দিল।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল দ্বিতীয় মহিলা। 'দরজা লাগিয়ে শুয়েও আজকাল ঘুম হতে চায় না আমার।'

'শুধু কি দরজা, জানালায়ও তালা লাগিয়ে দিয়েছি আমি,' বলল প্রথমজন। 'শুনেছি, জানালার কাঁচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানি খোলে। সেজন্যেই তালা। সাবধান থাকা ভাল।'

কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা,

'ছিটকানি খোলা চোরের কথা আমিও শুনেছি। আমাদের গলিতেই চুরি দুটো হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চুরির কথা শুনে বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই কান খাড়া করে দিয়েছে সে।

'মা আজকাল রোজ ঘুমাতে যাওয়ার আগে দরজা-জানালা চেক করে,' মুসা বলল। 'আমিও চিন্তায় পড়ে গেছি। কোনদিন যে আমার ফায়ারকে চুরি করে নিয়ে যায়!'

'ফায়ার' একটা ঘোড়ার নাম। মাঝে মাঝেই জন্তু-জানোয়ার পোষার শখ হয় মুসার। রাস্তায় জখম হয়ে ঘুরতে দেখে একবার একটা কুকুর আর গাধাকেও ধরে নিয়ে এসেছিল। তবে এই ঘোড়াটা ধরে আনেনি। কম দামে এক কারনিভলের মালিকের কাছ থেকে কিনেছে। টাকার অভাবে বিক্রি করে দিয়েছে মালিক।

'ঘোড়া নেবে না,' আশ্বস্ত করল কিশোর। 'বড় জিনিস, তার ওপর প্রাণী, লুকানোর অসুবিধে হবে। নিয়েই তো আর বেচে দিতে পারবে না।...এই যে, পেয়েছি।'

'কি?'

বইয়ের খোলা পাতাটায় আঙুল রাখল কিশোর। রঙিন ঝলমলে মহিলার পোশাক আর মুখোশ পরা একটা ছবি। দেখে মনে হয় মেয়ে। আসলে ছেলে। কারণ আসল ছবিটা ছাপা আছে কলামের মধ্যে। পাশে আরও একটা ছবি। ছেলেটারই বয়েসী একটা কিশোরী মেয়ের। মেয়েটা সুন্দরী।

'কারনিভল কুইন সেজেছিল,' কিশোর বলল। 'বহুকাল আগে এই মেয়েটাকে শহরের লোকে কারনিভলের রানী সাজিয়েছিল। ঠেলাগাড়িতে ফুলের বিছানা পেতে তার ওপর ওকে দাঁড় করিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুই পাশ আর পেছন থেকে নানা রকম জানোয়ারের মুখোশ পরে মিছিল করে গেছে লোকে। ওদের সঙ্গে ছিল ভাঁড়ের পোশাক পরা একজন। ওর ভাঁড়ামিতে হেসে গড়াগড়ি খেয়েছে লোকে। শহর প্রদক্ষিণ করে সবশেষে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় ওরা। অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রাতে খাবারের ব্যবস্থা করে। নানা রকম খেলাধুলা, হাসি-আনন্দ আর প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে শেষ হয় রাতটা। কেমন লাগছে শুনতে?'

'প্রচুর খাওয়া, তাই না? দারুণ। চমৎকার। এর চেয়ে ভাল কিছু আর হতেই পারে না।'

'এত ঘটা করে উৎসব আজকাল আর করতে চায় না লোকে। ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে। খালি তাড়াহুড়া করে।'

'কারনিভল কুইন কাকে বানাতে চাও? আমাকে?'

'নাহ্, তুমি অতিরিক্ত লম্বা। রানী মানাবে না। ঢ্যাঙা রানী হয়ে যাবে। রবিনকে করা যেতে পারে। পোশাকগুলো স্কুলে বসেই বানিয়ে নিতে পারব আমরা। ভাল লাগছে না শুনতে?'

'খাবারের মেন্যুটা কি?'

'এখানে যা লিখেছে, তোমার পছন্দই হবে।'

'ভাল, খুব ভাল। তাহলে কারনিভ্ল কুইনই সই। স্কুলের ফ্লোটটাকেই রানীর ফুলগাড়ি বানানোর পরামর্শ দেব। মিছিলের মেইন ফ্লোট। শহরের লোক যদি রাজি হয়ে যায়, দিলাম সেরে; অন্য স্কুলগুলোর মুখ চুন হয়ে যাবে। কখনও তো কোন স্কুলের ফ্লোটকে প্রাধান্য দেয়া হয় না, রেকর্ড করে ফেলব আমরা। কিন্তু রবিন যদি রানী হতে রাজি না হয়?'

'সেটা আমিও ভাবছি।'

'না হওয়ার অবশ্য কোন কারণ দেখছি না। বিরাট সম্মান ওর জন্যে। ফ্লোটে দাঁড়িয়ে যাবে। সারা শহরের লোকের নজর থাকবে ওর ওপর। ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে যাবে সে, আসল রানীর মতই। ভাবতেই রোমাঞ্চিত হচ্ছি আমি।'

'কি জানি। ওর মতিগতি ভাল ঠেকল না আমার আজকে,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'যাকগে। পরের মীটিঙেই স্কুলের ফেসটিভ্যাল কমিটিকে আমাদের আইডিয়াটা জানাব। দেখি কি বলে।'

'ভাঁড় সাজবে কে? তোমাকে পার্টটা দেয়ার পরামর্শ দেব কমিটিকে।'

'মাপ চাই, আমি ওসবে নেই। কিভাবে কি করতে হবে সেই পরামর্শ দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে চাই না আমি।'

'কাল সকালেই রবিনকে জানাব সব।' কানে হাত রেখে শোনার ভঙ্গি করল মুসা, 'আরে, কিসের শব্দ—বাড়িতে ফ্রিজের মধ্যে চকোলেট চিপ আইসক্রীম মচমচ করছে না? ডাকছে আমাকে। আসছি, আসছি, আইসক্রীম, এক্ষুণি চলে আসছি। দেরি নেই।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'এই, ওঠো। আমার আর খিদে সহ্য হচ্ছে না।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'চলো।'

হেঁটে যেতে ইচ্ছে করল না। বাসে চাপল দু'জনে।

বাড়ি এসে রান্নাঘরে ঢুকেই ফ্রিজ থেকে আগে আইসক্রীম বের করল মুসা। কিশোরকে নিয়ে খেতে বসে গেল।

মুসার আম্মা ঢুকলেন। মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন, 'কখন এলি তোরা?'

'এই তো, এইমাত্র,' জবাব দিল মুসা। 'মা, পার্টিটা কি সত্যি সত্যি হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিসের পার্টি?' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর।

'বলতে ভুলে গেছি তোমাকে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল মুসা, 'এক মাসের জন্যে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে চলে যাচ্ছে বাবা, শূটিং আছে। সেজন্যে একটা পার্টি দেবে মা।'

'তোর মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে পার্টি নয়, ডেন্টিস্টের কাছে যেতে বলা হয়েছে,' মা বললেন। 'তোর বন্ধুদের না বলতে বলেছিলাম?'

'ভুলে গিয়েছিলাম,' বাড়িতে বড়দের সঙ্গে এ ধরনের পার্টিগুলো ভাল লাগে না মুসার। ঝামেলা মনে হয়। 'বলব।'

'বলিস, একটা সারপ্রাইজ আছে।'

উদ্বেগ ফুটল মুসার চোখে, 'কি সারপ্রাইজ?'

'বলে দিলে সারপ্রাইজ কি আর সারপ্রাইজ থাকল নাকি?' পাশের ঘরে চলে গেলেন মিসেস আমান।

তিন

ওঅর্কশপে ঠকঠক শব্দ শুনে উঁকি দিল কিশোর। কাঠের কতগুলো পুরানো চেয়ার মেরামত করছেন রাশেদ পাশা। কিশোরকে দেখে কাজ থামিয়ে হাসলেন। 'ছয়টা চেয়ার, বুঝলি। ডাইনিং রূমে বসিয়ে দেব। ভালই হবে, কি বলিস?'

'হ্যাঁ।'

'এলি কোত্থেকে?'

'মুসাদের বাড়ি।'

হাসি ফুটল রাশেদ পাশার চোখে। 'চুরির তদন্ত করতে গিয়েছিলি নাকি?'

'নাহ্। কেন?'

'এই জানতে চাইলাম আরকি। পত্রিকায় লিখেছে তো, চুরি হয়েছে। ওদিক থেকে এসেছিস শুনে ভাবলাম, খোঁজ-খবর করতে চলে গেছিস।'

'মুসাদের বাড়ি গিয়েছিলাম অন্য কারণে। চাচা, চেয়ারগুলো মেরামত করতে কত দেরি হবে তোমার?'

'কেন?'

'না, এমনি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ভাতিজার দিকে তাকিয়ে রইলেন রাশেদ পাশা। মাথা নাড়লেন, 'উঁহু, এমনি এমনি কোন প্রশ্ন করার ছেলে তুই নোস। আসল কথাটা বলে ফেল।'

ফেসটিভ্যালের কথাটা চাচাকে জানাল কিশোর।

'তারমানে তুই জানতে চাচ্ছিস, ফ্লোট বানানোর কাজে আমি তোকে সাহায্য করব কিনা?'

মোলায়েম হাসি হাসল কিশোর, 'করলে ভাল হত, চাচা। তোমার মত ফিনিশিং খুব কম লোকেই দিতে পারে...'

'থাক, আর ফোলাতে হবে না। কবে দরকার?'

'এখনও ঠিক হয়নি। স্কুলের ফেসটিভ্যাল কমিটির মীটিঙে আগে কথাটা তুলি। তারপর জানাব তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। 'ঠিক আছে।' আবার হাতুড়ি তুলে নিলেন

তিনি।

ঘরের দিকে রওনা হলো কিশোর। মন জুড়ে আছে আগামী উৎসবের পরিকল্পনা।

*

পরদিন সকালেও রবিনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো না কিশোর আর মুসার। গিটার শেখে রবিন। টীচারের বাড়ি যাবে ওই সময়। মীটিঙে হাজির থাকার একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও থাকতে পারল না।

'যা সিদ্ধান্ত হয় পরে জানাব ওকে,' মীটিঙ যে ঘরে হবে, সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা। 'আমাদের বাড়িতে পার্টির দাওয়াতটাও ওই সময়ই দেব ওকে।'

'পার্টিটা তোমার এত অপছন্দ কেন বলো তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরে ধুর, ও কিছু হয় নাকি! কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকবে না। মা গিয়ে তার সব বন্ধুদের বলে আসবে। ওরা হাজির হবে একগাদা ছানাপোনা নিয়ে। আর ছানাও যা ছানা, ইবলিস একেকখান!' করুণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'ওগুলোকে সামলানোর দায়িত্বটাই হয়তো আমার ওপর চাপিয়ে দিল মা। তখন কি করব? তোমাদের মুসা আমানকে খুঁজে পাবে না আর কোনদিন। জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে...'

হেসে ফেলল কিশোর। 'অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? দরকার হয় আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

ভরসা পেল না মুসা। ওই 'ইবলিসগুলোর' কাছে কিশোরও নস্যি!

ঘরে ছয়-সাতজন লোক জমায়েত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা কেরি জনসন। কিশোরের সঙ্গে সরাসরি গণ্ডগোল না বাধালেও মনে মনে একটা রেষারেষির ভাব আছে কেরির। এর কারণ কিশোরকে ভয় পায় সে। কিশোরের বুদ্ধি তার চেয়ে অনেক বেশি। ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু নিয়ে যে সব পরামর্শ দেয়, কোনটাই অগ্রাহ্য করতে পারে না কেরি। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়, এগুলো তার মাথায় আসেনি কেন? তার ভয়, কোনদিন সম্পাদনার দায়িত্বটা কিশোরের হাতে চলে যায়।

মিস ওয়ান্ডার, কমিটির সভানেত্রী, একটা টেবিলে বসে পা দোলাচ্ছেন। সদস্যদের আসার অপেক্ষা করছেন। বেশ হই-চই হচ্ছে ঘরে।

কিশোর আর মুসাকে ঢুকতে দেখে সবার উদ্দেশ্যে হাত তুললেন, 'এই, থামো। চুপ করো। ফ্লোট নিয়ে ভাবতে বলেছিলাম যে, ভেবেছ কিছু?'

সবাই জানাল, ভেবেছে।

'বেশ, শোনা যাক তাহলে। এক এক করে বলো।'

কয়েকটা আইডিয়ার কথা বলা হলো। তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা চলল সেগুলো নিয়ে। চীনা আগুন-ঝরানো ড্রাগন বানানোর পরামর্শ দিল একজন। পছন্দ হলো না। বহুবার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে নাটিকা অভিনয় করতে করতে এগোনোর কথা বলল একজন। অতিরিক্ত জটিল। শুরু

থেকে শেষ পর্যন্ত সবটা না দেখতে পারলে দর্শকরাও মজা পাবে না। এত ঠেলাঠেলির মধ্যে সবটা দেখা বড় কঠিন কাজ। নাটক হলো এক জায়গায় বসে দেখার জিনিস। অতএব ওটাও বাদ। সবশেষে কিশোর বলল তার কার্নিভল কুইনের কথা।

'হ্যাঁ, এইটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে,' মিস ওয়ান্ডার বললেন। 'এর মধ্যে নতুনত্ব আছে।'

কিভাবে কি করবে বলতে লাগল কিশোর। 'মধ্যযুগীয় পোশাক পরব আমরা। প্রাচীন পোশাক পরা একজন বীনাবাদকও রাখা যেতে পারে। বাজাতে বাজাতে মিছিলের সঙ্গে যাবে সে।'

'একজন কুইনের দরকার হবে আমাদের। কাকে রানী বানানো যায়?' কেরির দিকে তাকালেন মিস ওয়ান্ডার।

রানী হওয়া সোজা কথা নয়। শহরের সমস্ত মানুষের নজর তার ওপর থাকবে। ভুলচুক হলে হাসির পাত্র হতে হবে। কি ঘটবে তখন ভাবতেই কুঁকড়ে গেল কেরি। দু'হাত নেড়ে মানা করে দিল, সে হতে চায় না।

ঘরে মেয়ে যারা আছে, তাদের কেউই রানী হতে চাইল না। কিশোর প্রস্তাব দিল শেষে, 'মেয়েদের কেউ হতে না চাইলে ছেলেদের মধ্যে থেকেই বানানো যেতে পারে। এটা আগেও হয়েছে। রবিনকে রানী বানালে কেমন হয়?'

'সে কি হতে চাইবে?'

'আমি বললে হবে।'

আবার আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলল। শেষে মিস ওয়ান্ডার বললেন, 'হাতে সময় খুব কম, মাত্র পনেরো দিন, এর মধ্যে অনেক কাজ সারতে হবে। স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো করতে হবে তোমাদের। তবু, আজকেই তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার নেই। কাল আবার বসব। কাকে কোন দায়িত্বটা দেয়া যায়, সেটাও ঠিক করব কাল।'

লাঞ্চের সময় রবিনের খোঁজ করল কিশোর আর মুসা। ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল বিড ওয়াকারকে।

'রবিনকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'ওই নতুন ছেলেটার সঙ্গে গেছে।'

তাড়াহুড়া করে ক্লাসের দিকে চলে গেল বিড।

মৃদু কণ্ঠে মুসা বলল, 'ঘটনাটা কি রবিনের? ছেলেটার সঙ্গে এত খাতির কিসের? দেখা হলে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'না,' মানা করে দিল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গি। 'এখনই কিছু বলতে যেয়ো না। আগে দেখতে চাই কি করে।'

'এর মধ্যে কোন রহস্য আছে ভাবছ নাকি?'

'দেখতে থাকি। বোঝা যাবে।'

অবশেষে রবিনকে খুঁজে বের করল ওরা। কেয়ারটেকারের ছাউনির কাছে একটা নিচু দেয়ালে চড়ে বসে আছে। সঙ্গে রয়েছে টম জুবের। ওদের ঘিরে রেখেছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে।

টমের সঙ্গে তিন তাস খেলছে রবিন। তিনটে তাস দেয়ালের ওপর উপুড় করে রেখেছে টম।

'ওই যে ওটা,' বাঁ পাশের তাসটা দেখাল রবিন।

তাসটা তুলে নিল টম। চিত করল। একটা রানী।

'সহজ,' বলল রবিন।

'তোমার খেয়াল রাখার ক্ষমতা অসাধারণ,' প্রশংসা করল টম। 'কিন্তু আর বলতে পারবে না।...বাজি ধরবে? এক ডলার। হয়ে যাক, কি বলো?'

'ঠিক আছে।'

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর।

তিনটে তাসকে দ্রুত ওলট-পালট, চালাচালি করে দেয়ালে উপুড় করে রাখল আবার টম। 'এবার বলো তো, কোনটা রানী?'

'মাঝেরটা,' বলে দিল রবিন। 'এ কোন ব্যাপার হলো নাকি।'

তুলে নিল টম। চিত করল। চিড়িতনের তিন। গুঙিয়ে উঠল রবিন। হেসে উঠল দর্শকরা।

'আরেকবার চেষ্টা করবে?' টম বলল, 'দেখো, তোমার ডলারটা ফেরত নিতে পারো নাকি।'

'নাহ্, থাক। তুমি অনেক বেশি চালাক। পারব না তোমার সঙ্গে।' কিশোর আর মুসার ওপর চোখ পড়ল রবিনের। 'দেখলে?' মাথা দুলিয়ে প্রশংসার সুরে ওদেরকে বলল, 'সাংঘাতিক হাত চালু ওর!'

'ও তো জুয়া খেলছে!' বাঁকা চোখে টমের দিকে তাকাল মুসা। রবিনকে বলল, 'মীটিঙের খবর শুনবে?'

দেয়াল থেকে নেমে এল রবিন। সরে এল ছেলেদের ঘের থেকে। অন্য একটা ছেলে বাজি ধরছে তখন টমের সঙ্গে।

কারনিভল কুইনের কথাটা জানানো হলো রবিনকে। রানী হবে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর। জ্বলজ্বল করে উঠল রবিনের চোখ। এক কথায় রাজি।

'আমি জানতাম তুমি হতে চাইবে,' খুশি হলো মুসা। 'ফ্লোটে চড়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, সবার চোখ থাকবে তোমার ওপর, দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে যাবে প্রেসিডেন্টের মত...ইস্, কেন যে এত লম্বা হলাম আমি!'

'নিশ্চয় ভিডিও করা হবে গত বছরের মত?' জানতে চাইল রবিন।

'তা তো হবেই,' কিশোর বলল। 'এত্তবড় একটা ঘটনা। আমার তো ধারণা টেলিভিশনেও দেখানো হবে।'

'গত বছর ভিডিও করেছিল কেরি,' মুসা বলল। 'ভাল হয়নি। এবার মিস ওয়াল্ডারকে বলব, তোমাকে যেন করতে দেন।'

চুপ করে রইল কিশোর।

রবিনকে পার্টির দাওয়াত দিল মুসা।

'টমকে বলবে না?' অনুরোধের সুরে বলল রবিন।

'বলব!' চট করে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। রবিনের দিকে ফিরল। 'ঠিক আছে, আসতে চাইলে আসুক। তুমিই বলে দিয়ো।'

'আচ্ছা। ও খুব খুশি হবে। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে পাগল হয়ে আছে সে। যাই, বলিগে ওকে।'

টমকে বলার জন্যে তাড়াহুড়া করে ভিড় ঠেলে গিয়ে ভেতরে ঢুকল রবিন।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমাদের পার্টিটা বোধহয় জমতে যাচ্ছে এবার।'

চার

মোটেও খুশি নয় মুসা। তার ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক হয়েছে। যে সব বন্ধুদের দাওয়াত দিয়েছেন তার আম্মা, তাদের বাচ্চাকাচ্চায় বোঝাই হয়ে গেছে বাড়ি। একটা ক্যাটারিং ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে বুফের ব্যবস্থা করেছেন মিসেস আমান। পার্টির জন্যে ধোপদুরস্ত পোশাক পরতে বাধ্য করেছেন মুসাকে, যে পোশাকগুলো তার মোটেও পছন্দ নয়।

হলঘরে এখানে ওখানে জটলা করছে বয়স্করা। কথা বলছে মর্টগেজ, সেভিংস অ্যাকাউন্ট আর মুসার মতে ওই ধরনেরই একঘেয়ে বিরক্তিকর সব নীরস বিষয় নিয়ে। অবশেষে চুরির কথায় এল কয়েকজন। সারা ঘর আর সিঁড়িতে দৌড়াদৌড়ি করছে বাচ্চারা। বাড়ি মাথায় করেছে।

সবার কাছ থেকে দূরে এককোণে দাঁড়িয়ে আছে মুসার বন্ধুরা–বিড, কিশোর, রবিন আর টম।

একনাগাড়ে কথা বলছে টম। খালি নিজের বাহাদুরির কথা। ভাল লাগছে না কিশোরের। ছেলেটা বিরক্তিকর।

এতবড় বাড়ি মুসাদের, ভাবতে পারেনি সে। বলল, 'তোমাকে দেখে তো মনে হয় না এ রকম বাড়ির ছেলে।'

'কোন্ রকম বাড়ির মনে হয়?'

মুসার প্রশ্নের জবাব দিল না টম। আপনমনে বলতে লাগল, 'এত টাকা থাকলে শোফারে চালানো রোলস রয়েসে চড়ে স্কুলে যেতাম। আমার ওপর নজর দিতে বাধ্য করতাম সবাইকে।'

'যতটা ভাবছ ততটা বড়লোক নই আমরা,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'অনেকখানি জায়গা, এটা অবশ্য বলতে পারো। র‍্যাঞ্চ হাউসগুলো এ রকম বড়ই হয়। বাবা একজনের কাছ থেকে সস্তায় কিনেছে।'

'সেই "সম্ভাটাও" নিশ্চয় একটা বিরাট অঙ্ক।'

প্রসঙ্গটা ভাল লাগল না মুসার। চুপ হয়ে গেল।

হেসে বলল রবিন, 'রোলস রয়েসে না গেলেও ইচ্ছে করলে ফায়ারে চড়ে যেতে পারে মুসা।'

বুঝতে পারল না টম। অবাক হয়ে জানতে চাইল 'ফায়ার' জিনিসটা কি? নতুন কোন কোম্পানির গাড়ি নাকি?

বুঝিয়ে দিল রবিন।

'ঘোড়া! ঘোড়ার মত পচা জানোয়ার দিয়ে কি করো তুমি?' ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল টম, যেন ঘরের মধ্যেই ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে, 'কোথায় ওটা?'

ফায়ারের ব্যাপারে কারও কোন খারাপ মন্তব্য সহ্য করতে পারে না মুসা। মনে মনে রেগে গেলেও দাওয়াত করে আনা মেহমানকে কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

টম যদি ফায়ারের ব্যাপারে এ রকম করে বলতেই থাকে বেশিক্ষণ সহ্য করবে না মুসা, বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'কই, আন্টির সারপ্রাইজটা কোথায়? এখনও প্রকাশ করছেন না কেন?'

ঘড়ি দেখল টম। 'দশ মিনিটের মধ্যেই করবেন।'

ভুরু কুঁচকাল মুসা, 'তুমি জানলে কি করে?'

টমের হয়ে হেসে জবাব দিল রবিন, 'আপাতত গোপন রাখা হচ্ছে সেটা। জানতে পারবে।'

'তাজ্জব ব্যাপার! আমার বাড়িতে কি ঘটছে আমিই জানি না, অথচ বাইরের সবাই জানে!...নাহ্, না খেয়ে আর কথা বলতে পারব না। পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। কারও খিদে পেয়ে থাকলে এসো,' লোভনীয় সব খাবারে ভরা লম্বা বুফে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল মুসা। সে বাদে আর কারও খাওয়ার ইচ্ছে নেই এত সকাল সকাল। তবে কিশোর এগোল তার পেছন পেছন। টম আর রবিন দাঁড়িয়ে রইল আগের জায়গায়।

'ঘাড়টা মটকে দিতে ইচ্ছে করছিল,' একটা প্লেটে খাবার তুলে নিতে নিতে বলল মুসা, 'ফায়ারকে পচা বলে! কসম খোদার, ওর মত বাজে ছেলের সঙ্গে জীবনে দেখা হয়নি আমার। আমার মা কি করবে সেটাও নাকি সে জানে। স্রেফ ধাপ্পাবাজি! আমাকে তাক লাগানোর চেষ্টা।' খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'নিচ্ছ না কেন?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'এখন না, পরে।...রবিনও কিছু জানে বলে মনে হলো। সে-ও নিশ্চয় ধাপ্পা দেয়নি। আন্টি হয়তো সারপ্রাইজটা কি হবে বলেছেন তাকে, সে বলে দিয়েছে টমকে। তবে একটা কথা ঠিক, টম ছেলেটাকে আমারও পছন্দ হচ্ছে না। কেমন যেন!'

'বিডকে জিজ্ঞেস করে দেখোগে, একই কথা বলবে...'

এই সময় কোলাহল ছাপিয়ে মিসেস আমানের কণ্ঠ শোনা গেল, 'ড্রইং-রুমে চলে আসুন সবাই; সামান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'ওই যে,' মুসা বলল, 'মা'র জঘন্যতম সারপ্রাইজের আহ্বান।'

লম্বা, বড় ড্রইং-রুম। জানালায় ভারী পর্দা। ফ্রেঞ্চ উইনডো টাইপের বড় বড় জানালা দিয়ে পেছনের বিরাট বাগানটা দেখা যায়। ঘরের আসবাবগুলো সব একপাশে জড় করে রাখা হয়েছে। মাঝখানের খালি জায়গায় একদিকে মুখ করে বসানো হয়েছে সারি সারি চেয়ার।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রবিন। টমকে দেখা যাচ্ছে না।

মুসা আর কিশোরকে দেখে রবিন বলল, 'চলো সামনের সারিতে গিয়ে বসি। ভালমত দেখতে পারব।'

সামনের একটুখানি খোলা জায়গার পেছনে পর্দা টানানো। সামনে একটা টেবিলে রাখা নানা রকম জিনিস। তার পাশে মেঝেতে রাখা ট্রাংকের মত দেখতে একটা কালো বাক্স। বাক্সের গায়ে লেখা :

দি গ্রেট মিসটিরিয়োসো।

'অ, ম্যাজিক শো,' মুসা আর রবিনের মাঝখানে বসে পড়ল কিশোর।

মেহমানরা সবাই বসল। কে একজন গিয়ে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। পর্দার ওপরে একটা আলো জ্বলে রইল কেবল। গোল হয়ে আলো এসে পড়ছে মেঝেতে।

বুম করে বোমা ফাটার মত শব্দ হলো, তীব্র আলোর ঝলকানি, তারপর এক ঝলক লাল ধোঁয়া। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লম্বা একজন মানুষকে। পরনে কালো আলখেল্লা। মাথায় বাবরি চুল।

ইনিই তাহলে 'দি গ্রেট মিসটিরিয়োসো'—ভাবছে কিশোর।

'গুড ইভনিং, লেডিজ, জেন্টলমেন অ্যান্ড চিলড্রেন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল লোকটা, 'আমার জাদুর ভুবনে স্বাগতম। প্রথমে আমার সহকারী সারালিন দ্য ক্লাউনের সঙ্গে পরিচিত হোন।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক মহিলা। দর্শকদের দিকে ফিরে বাউ করল। পরনে লাল ট্রাউজার, তাতে কালো কালো ফুটকি। গায়ে রামধনু রঙের ব্রেইস। মুখে রবারের মুখোশ, ভাঁড়েরা যেসব পরে। পেছনে ফুলে-ফেঁপে রয়েছে সোনালি রঙের চুল। পরচুলা পরেছে।

'টমের আম্মা,' ফিসফিস করে মুসা আর কিশোরকে বলল রবিন।

'তুমি জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গ্রেট মিসটিরিয়োসো হলেন টমের বাবা,' রবিন বলল। 'টম আমাকে বলেছে। চুপ করে দেখতে থাকো এখন।'

শো শুরু হলো। ভাঁড়ের মুখ থেকে টেনে টেনে একের পর এক রঙিন নিশান বের করল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। রুমালের ভেতর থেকে বোতল বের করল, আবার গায়েব করে দিল। কতগুলো লাল বল বের করে লোফালুফি করল ভাঁড়, তারপর ছুঁড়ে দিল গ্রেট মিসটিরিয়োসোর দিকে। তার হাতের তালুতে গিয়ে পড়তে লাগল বলগুলো, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়েব। তারপর নাক-মুখ-চোখ-কান, যেখান থেকে খুশি সেগুলো আবার বের করতে লাগল গ্রেট মিসটিরিয়োসো।

অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না মুসা, কি করে এটা করছে লোকটা। মনে মনে তার হাত সাফাইয়ের প্রশংসা না করে পারল না।

'এখন,' ঘোষণা করল গ্রেট মিসটিরিয়োসো, 'আমি দেখাব এক মজার খেলা। আপনাদের মধ্য থেকে একজন সাহসী লোক দরকার। কে আসবেন?'

এগিয়ে এসে রবিনের হাত চেপে ধরল ভাঁড়। টেনে নিয়ে গেল গ্রেট মিসটিরিয়োসোর কাছে।

'বাহ্, ভাল একজনকে নিয়ে এসেছ,' বলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'নাম কি তোমার, ব্রেভ বয়?'

'রবিন,' বলে কিশোর আর মুসার দিকে ফিরে চোখ টিপে হাসল সে।

কালো বাক্সের ডালা তুলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'দেখা যাক তোমার কত সাহস। ঢুকে পড়ো তো দেখি আমার জাদুর বাক্সের মধ্যে।'

বাক্সের ধার ডিঙিয়ে ভেতরে পা রাখল রবিন। বসে পড়ল উবু হয়ে। ডালা নামিয়ে, হুড়কো লাগিয়ে, তাতে তালা আটকে দিল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। চাবিটা দিল ভাঁড়ের হাতে। ভাঁড় সেটা পকেটে রেখে দিল। রাখতে দেখল সবাই।

বাক্সের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'এখন, আপনাদের চোখের সামনে আমি রবিনকে গায়েব করে দেব।'

আবার আলোর ঝিলিক, রঙিন ধোঁয়া। আগের মতই রয়েছে বাক্সটা। কোন পরিবর্তন নেই।

ভাঁড়ের দিকে হাত বাড়াল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'চাবিটা, প্লীজ।'

পকেটে হাত দিল ভাঁড়। বের করে আনল শূন্য হাত। চিৎকার করে উঠল, 'হায় হায়, নেই তো!'

'সর্বনাশ! কি বলছ! তালা খুলতে না পারলে দম আটকে মরবে ছেলেটা। এখনও গায়েব হয়নি।' হতাশ ভঙ্গিতে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো, 'আজকাল যোগ্য লোকের বড় অভাব। ভাল একজন সহকারীও পাওয়া যায় না।'

বাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই তালায় লাগার মত চাবি আছে কারও কাছে?'

সামনের সারিতে বসা দর্শকদের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে মুসার ওপর এসে থামল তার দৃষ্টি। এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরে টেনে তুলল তাকে। 'ইয়াং ম্যান, তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তালাটার চাবি আছে তোমার কাছে।'

'না না, নেই!' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা।

'কোন চাবি নেই?'

'কোন চাবি...আমাদের ঘরের চাবি আছে, কিন্তু...'

'নিয়ে এসো।'

দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে চাবির গোছা নিয়ে এল মুসা।

হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল ম্যাজিশিয়ান। একটা চাবি

বেছে বের করে রিঙ থেকে খুলে নিল সেটা। 'মনে হয় চলবে এতে।'

'এটা আমাদের সামনের দরজার চাবি। বাক্সের তালা খুলবে বলে তো মনে হয় না।'

'দেখা যাক, জাদুটাদু করে কিছু করা যায় কিনা,' চাবিটা ফিরিয়ে দিল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'যাও, তালায় ঢোকাও।'

বাক্সের সামনে বসে তালায় চাবি ঢোকাল মুসা। খাপে খাপে ঢুকে গেল মোচড় দিতেই খুলে গেল তালাটা।

'খাইছে!' ইলেকট্রিক শক খেয়ে যেন ছিটকে পিছিয়ে এল মুসা।

'খবরদার, হাত দেবে না ডালায়!' সাবধান করল ম্যাজিশিয়ান। 'হাত পুড়ে যাবে!' বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার ভান করল। ডালাটা একপাশ থেকে চেপে ধরে একটানে উঁচু করে ফেলল।

ভেতরে খালি।

রবিন নেই।

মুগ্ধ দর্শকদের তুমুল করতালি ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'বাক্সের পেছনে লুকিয়ে আছে ও!'

আলখেল্লার ঝুল দুলিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। নিচু হয়ে পটাপট কতগুলো 'ক্যাচ' খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। ধসে পড়ল বাক্সটা। পেছনেও কেউ নেই। ভেতরে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বাক্সটাই আর বাক্স নেই।

দর্শকদের করতালি আরও বেড়ে গেল।

মুসার হাত থেকে চাবি আর গোছাটা নিয়ে আবার আগের মত রিঙে ঢোকাল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। ফিরিয়ে দিল মুসাকে।

কিছুতেই পরাজয় মেনে নিতে পারল না মুসা। চিৎকার করে উঠল, 'পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে রবিনকে।'

'এত অবিশ্বাসী ছেলে তো জীবনে দেখিনি,' চোখ বড় বড় করে ফেলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। দর্শকদের দিকে নজর রেখে বলল, 'সারালিন দ্য ক্লাউন দয়া করে এখানে এসো তো একবার।'

ফিরে তাকাল কিশোর। ভাঁড় যে ওখানে নেই, খেয়াল করেনি এতক্ষণ। ঘরের পেছন থেকে এগিয়ে এল সারালিন।

'পর্দা সরিয়ে দেখিয়ে দাও,' আদেশ দিল তাকে গ্রেট মিসটিরিয়োসো।

টেনে পর্দা সরিয়ে দিল সারালিন। সোনালি চুল এক মহিলা বেরিয়ে এল পর্দার অন্যপাশ থেকে।

চোখ মিটমিট করতে লাগল মুসা। চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'আমার স্ত্রী সারার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' গ্রেট মিসটিরিয়োসো বলল। 'সারালিন দ্য ক্লাউনের আড়ালে কার মুখ লুকিয়ে আছে, তা-ও দেখাচ্ছি আপনাদের।...মুখোশ খোলো।'

মুখোশ খুলে ফেলল ভাঁড়। বেরিয়ে পড়ল রবিনের হাসি হাসি মুখ।

দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগল সে।
তিনজনে হাত ধরাধরি করে দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বাউ করল।
নতুন করে করতালি আর উল্লসিত চিৎকার শুরু হলো।
হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়ল মুসা।
বেরিয়ে গেল তিন জাদুকর।
উঠে দাঁড়িয়ে মেহমানদের শান্ত হতে অনুরোধ করলেন মিসেস আমান। 'বাচ্চাদের জন্যে পার্টি গেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশের ঘরে চলে যাও,' বললেন তিনি। 'বড়দের জন্যে মিউজিক। আসুন, নাচে যোগ দিন।'
মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বুঝলে?'
'কিছুই বুঝলাম না,' জবাব দিল মুসা। 'কিভাবে যে ঘটনাটা ঘটাল...তবে অন্য চাবি দিয়ে তালা খোলার রহস্যটা জানি। রিঙ থেকে খুলে নিয়ে যে চাবিটা আমার হাতে দিল, ওটা আমাদের চাবি নয়। দেখতে প্রায় এক রকম হলেও তফাৎটা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। আমাদের চাবিটা হাতের তালুতে লুকিয়ে রেখে অন্য একটা দিয়েছে, যেটা দিয়ে বাক্স খোলা যায়। তারপর আবার কায়দা করে ওদেরটা ফেরত নিয়ে আমাদেরটা দিয়ে দিয়েছে।'
আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর, 'কি করে বুঝলে?'
হাসল মুসা। 'বুঝলাম, ওটাতে আমার নামের আদ্যক্ষরটা আঁচড় কেটে লিখে দিয়েছিলাম–এম। নজরে পড়েনি।' চাবির গোছা বের করে দেখাল মুসা। 'এই দেখো। টিন ওপেনারের চোখা মাথা দিয়ে লিখেছি। তখনই ফাঁস করে দিতে পারতাম, কিন্তু মা'র শো'টা পণ্ড করতে চাইনি।'
'দেয়া উচিত ছিল। ফাঁস হত না, সেটা বরং বেশি মজার হত। গ্রেট মিসটিরিয়োসোর কাঁচুমাচু মুখ দেখে অনেক বেশি মজা পেত দর্শকরা।'
'কিন্তু এখন আর হবে না, সুযোগটা হারিয়েছি,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'সবার খেয়াল এখন নাচের দিকে। বুফে টেবিলের কাছে কেউ নেই। এই সুযোগটা আর হারাতে চাই না। সময় থাকতে থাকতে আরেক প্লেট সাবাড় করে ফেলি। যাবে?'
টেবিলের কাছে কেউ নেই বললেও বিডকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে বলল, 'খিদে পেয়েছে। ওখানে হট্টগোলের মধ্যে থাকতেও ভাল লাগছিল না।'
'শুরু করে দাও,' মুসা বলল। 'সবাই এসে গেলে হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। একটা টুকরোও আর মুখে দিতে পারবে না।'
প্লেটে খাবার নিতে নিতে বিড বলল, 'কিন্তু রবিনের ব্যাপারটা কি বলো তো? জুবের পরিবারের সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলেছে। বিকেল থেকে টমের সঙ্গে ছিল। তোমাদের চেয়ে বড় বন্ধু হয়ে গেছে টম এখন ওর।'
চিন্তিত ভঙ্গিতে বিডের দিকে তাকাল কিশোর। জবাব দিল না।
মুসা বলল, 'আমার অবাক লাগছে। সত্যি সত্যি জাদু শিখে গেছে ও। বাক্স থেকে পালাল কি করে?'
'জানলে তো আমিও ম্যাজিশিয়ান হয়ে যেতাম,' বিড বলল। 'তবে খুবই

সহজ কোন উপায়ে পালিয়েছে, সন্দেহ নেই।'

চুপচাপ খেতে থাকল তিনজনে।

খাওয়া শেষ হলে বিড বলল, 'আমার বড্ড মাথা ধরেছে। আর থাকতে পারছি না। মুসা, কিছু মনে কোরো না, ভাই, আমি যাচ্ছি। আন্টিকে বোলো।'

'ট্যাবলেট আছে। এনে দেব?'

'না, লাগবে না, থ্যাংক ইউ। বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকব।'

দরজার দিকে এগোল বিড।

আগের ঘরে ফিরে এল কিশোর আর মুসা। বড়রা নাচছে। একধারে টমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে রবিন।

'রবিনকে জাদু করে ফেলল নাকি ছেলেটা!' না বলে পারল না আর মুসা।

'কাল জিজ্ঞেস করব রবিনকে,' কিশোর বলল। 'কি করে বাক্স থেকে পালাল ও, সেটাও জেনে নেব।'

'যদি না বলে? জাদুকরের "সিক্রেট" বলে এড়িয়ে যেতে চায়? হয়তো শেখানোর আগে কাউকে না বলার জন্যে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে গ্রেট মিসটিরিয়োসো। শুনেছি, ম্যাজিশিয়ানরা তাই করে।'

পাঁচ

'আরে বলো না। বলে ফেলো। কিছু হবে না,' কিশোর বলল।

পরদিন সকালে ক্লাসরুমে কথা বলছে ওরা। ফেসটিভ্যাল মীটিং শুরু হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

মাথা নাড়ল রবিন, 'না, ভাই, আমি গোপন রাখব প্রতিজ্ঞা করেছি ওদের কাছে। কাউকে বলা যাবে না।'

'কিন্তু "কাউকে"র মধ্যে পড়ি না আমরা,' মুসা বলল। 'তিন গোয়েন্দা–মানে তিনজন মিলে একজন, তাই তো? কারও কথা কারও কাছে গোপন রাখি না আমরা। তোমার মনে থাকা আর আমাদের মনে থাকা একই কথা। অন্য কাউকেই বলতে যাচ্ছি না আমরা।'

হেসে ফেলল রবিন, 'আহা, কি যুক্তি। ঠিক আছে, টেনশনে রেখে লাভ নেই তোমাদের–বলেই ফেলি। কিশোরকে নিয়ে চিন্তা নেই, ও কাউকে বলবে না; কিন্তু তুমি সাবধান থাকবে। পেট থেকে যেন কোনমতেই না বেরোয়।'

'নিশ্চিন্তে বলে ফেলো।'

'বাক্সের পেছনে একটা ফোকর আছে, ঝাঁপ লাগানো। সহজে বোঝা যায় না। ধোঁয়ার মধ্যে গা আড়াল করে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম আমি। তারপর জানালা দিয়ে সোজা বাগানে। দর্শকদের অলক্ষে টমের মা-ও বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ভাঁড়ের পোশাকটা আমি পরে নিলাম। তিনি তখন জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। একেবারেই

সহজ, তাই না?'

'জানালার তো ছিটকানি লাগানো থাকে,' মুসা বলল। 'সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে খুললে কি করে?'

'আগেই খুলে রাখা হয়েছিল। আমি শুধু পাল্লাটা ঠেলে ফাঁক করে বাগানে নেমে গিয়েছিলাম।'

'বিড ঠিকই বলেছিল—সহজ কোন উপায়ে কাজটা সারা হয়েছে। তাই তো দেখছি এখন।'

'কাল নাচের সময় দেখলাম না ওকে। কোথায় ছিল?'

'মাথা ধরেছিল। খেয়েই বাড়ি চলে গিয়েছিল। টমের সঙ্গে তোমার মাখামাখিটা ওর নজরেও পড়েছে।'

হঠাৎ রেগে গেল রবিন, 'নজরে পড়ল তো কি হয়েছে? ও কি আমার মালিক নাকি? কার সঙ্গে মাখামাখি করব না করব, সেটা আমার ব্যাপার। ওকে জিজ্ঞেস করে করতে হবে নাকি?'

'খামাখা রাগছ। ও কিন্তু তেমন করে বলেনি...'

আর কিছু বলার সুযোগ হলো না। ফেসটিভ্যালের বাকি সদস্যরা ঘরে ঢুকতে শুরু করল।

মিস ওয়ান্ডার গিয়ে তাঁর গতদিনের আসনটায় উঠে বসলেন। টেবিলের ওপর। সরাসরি কাজের কথায় এলেন, 'শোনো সবাই, আজকে যার যার কাজ ভাগ করে দিয়ে তবেই বেরোব। সময় কম। কাজ অনেক। আলোচনা সংক্ষেপ করা দরকার।'

প্রচুর হই-হট্টগোল, তর্কাতর্কির পর অবশেষে যার যার কাজ ভাগ করে দিলেন মিস ওয়ান্ডার। মুসা আর কিশোরের ওপর পড়ল ফ্লোট বানানোর দায়িত্ব। ওদের সাহায্য করবে উডওয়ার্ক আর আর্ট ডিপার্টমেন্ট। ফাইনাল সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, রবিনই সাজবে কারনিভ্ল কুইন।

মীটিং শেষে মিস ওয়ান্ডারকে বলল রবিন, 'রানীর কাজটা কি হবে, মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি কিশোরের কাছে। ভাবছি, টমের বাবার সঙ্গে কথা বলব। ম্যাজিশিয়ান তো, নতুন কোন আইডিয়া দিতে পারবেন। রানী প্লাস ম্যাজিক—ভাল হবে, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, চমৎকার হবে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস ওয়ান্ডার, 'দেখো কথা বলে।'

ক্লাসের বাইরে রবিনকে পাকড়াও করল মুসা। 'ম্যাজিশিয়ান নতুন কি আইডিয়া দেবে? রানীর হ্যাটের নিচ থেকে জ্যান্ত কবুতর আর খরগোশ বের করার প্ল্যান করেছ নাকি? রানীর আর ইজ্জত থাকবে না তাহলে।'

'না থাকার কি হলো? ম্যাজিক ম্যাজিকই। যে কোন ক্ষমতা অর্জন করা মানেই বাড়তি গুণের পরিচয়। ফ্লোটের ওপর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে শুধু হাত নাড়ার চেয়ে অনেক ভাল। টমকেও বলতে পারি সাহায্য করার জন্যে। মিস ওয়ান্ডার যখন রাজি হয়েছেন, এটা নিয়ে আর তর্কাতর্কির কিছু নেই।'

'জাদু করে ওই টম ছোঁড়াটাকে যদি চিরকালের জন্যে গায়েব করে দেয়া যেত, সবচেয়ে ভাল হত।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'ওর বিরুদ্ধে এত আক্রোশ কেন তোমার? দেখতেই পারো না।'

'দেখার মত চরিত্র হলে তো দেখতে পারব। ওর বাগাড়ম্বর আমার একেবারে সহ্য হয় না।'

'কথা একটু বেশি বলে বটে, তবে ছেলে ও খারাপ না। মিশলেই বুঝতে। চলি। পরে কথা হবে।'

করিডর ধরে দ্রুত হেঁটে গেল রবিন।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'শুনলে কি বলল? ছেলে নাকি খারাপ না।'

'হতেও পারে।'

চোখ গোল গোল করে ফেলল মুসা, 'তুমিও বলছ! ও একটা শয়তান! রবিন বিশ্বাস করুক আর না করুক।'

মুখে যাই বলুক, মনে মনে দুশ্চিন্তা কিশোরেরও হচ্ছে। চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। তার আশঙ্কা হচ্ছে, ওদের তিনজনের বন্ধুত্বে মস্ত এক ফাটল ধরাতে যাচ্ছে টম ছেলেটা।

ছয়

পরদিন সকালে ডাকবাক্স থেকে একগাদা চিঠি বের করে এনে নাস্তার টেবিলে বসলেন রাশেদ পাশা। একটা লীফলেটও পেয়েছেন ডোরম্যাটের নিচে।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাগজটার দিকে চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন মেরিচাচী। পড়লেন, 'ফেইথ হীলার সারালিন জুবেরের চ্যালেঞ্জ। শুধু বিশ্বাস আর মনের জোরে কত জটিল রোগ সারানো সম্ভব, নিজের চোখে এসে দেখুন।' লেখার বাকি অংশটা নীরবে পড়ে হাসলেন তিনি। 'বাহ্, টাউন হলে আবার পাবলিক মীটিঙেরও ব্যবস্থা করেছে দেখা যাচ্ছে আজ রাতে।'

টেবিলে বসে খাচ্ছে তাঁর বোনের ছেলে ডন। 'ফেইথ হীলার জিনিসটা কি?'

'জিনিস নয়। ফেইথ হীলিং–একটা ক্ষমতা। যারা সেটা অর্জন করে, তাদের বলে ফেইথ হীলার। এরা দাবি করে, ওষুধ ছাড়াই যে কোন রোগ সারিয়ে দিতে পারে। যত্তসব ফালতু কথা।'

চাচার কাঁধের ওপর দিয়ে লীফলেটটার দিকে তাকাল কিশোর। চাচীর দিকে ফিরল। 'বিশ্বাস করো না তুমি?'

'না, একেবারেই না। রীতিমত ঠগবাজি। যত বুলিই ঝাড়ুক, সত্যিকারের অসুস্থ কোন মানুষের রোগ সারানোর ক্ষমতা নেই এই সারালিন জুবেরের।'

চাচার হাত থেকে লীফলেটটা নিল কিশোর। 'সারালিনের ছেলে টম আমাদের স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে।'

টম আর তার বাবা-মা'র সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে, চাচা-চাচীকে জানাল

সে।

কিশোর যখন কথা বলছে, তার হাত থেকে লীফলেটটা নিয়ে সেটা দিয়ে অ্যারোপ্লেন বানাতে শুরু করল ডন।

'আরে আমি পড়িনি তো,' কাগজটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

হাত সরিয়ে নিল ডন। দিল না।

'আহ্, কি শুরু করলি!' ধমক দিলেন মেরিচাচী। 'নাস্তার টেবিলেও ঝগড়া। বনাবনতি কি কোনদিন হবে না তোদের? এই ডন, দে কাগজটা। স্কুলের ব্যাগ গোছাগে জলদি। দেরি হয়ে যাবে।'

ডনের বাবা আইব্রাম হেনরি স্টোকার অনেক বড় বিজ্ঞানী। অ্যারিজোনায় বাড়ি। বেশ কিছুদিনের জন্যে ডনের বাবা-মা বিশেষ কাজে দেশের বাইরে চলে যাওয়ার সময় ডনকে রেখে গেছেন রকি বীচে। খালি খালি বসে থাকবে বাড়িতে, তাই কিশোরদের স্কুলেই ভর্তি করে দিয়েছেন মেরিচাচী।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটা কিশোরকে দিয়ে উঠে গেল ডন।

সেদিন স্কুলে এসে কিশোর জানতে পারল, ওরকম বহু লীফলেট বিলি করা হয়েছে শহরে।

'মহিলা একটা ঠগ,' মুসা বলল, 'বাজি রেখে বলতে পারি।'

'চাচীও তাই বলল। তবু নিজের চোখে দেখতে চাই আমি ব্যাপারটা।'

'অন্যেরটা দেখে কিছু বোঝা যাবে না, প্রমাণ করতে হবে। তোমার কোন জটিল রোগ আছে?'

'নেই।...রবিন কোথায়? যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতাম ওকে।'

'আর যা-ই বলো না বলো, টমদের সম্পর্কে কিছু বলতে যেয়ো না। আমার ধারণা, তোমার কথাও সহ্য করবে না এখন ও। কেমন যেন হয়ে গেল রবিনটা!'

টাউন হলে দু'শো লোক বসার ব্যবস্থা আছে। কিশোর আর মুসা যখন ঢুকল, অর্ধেকের বেশি ভরে গেছে।

কিশোরের কানে কানে ফিসফিস করে বলল মুসা, 'কি মনে হয়, এরা সবাই জটিল রোগের রোগী?'

'বলা মুশকিল,' চেয়ারে বসা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। কিন্তু মুখ দেখে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব না।

মঞ্চে লোক নেই। আছে একটা মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড। উঁচু একটা টুল রাখা হয়েছে ওটার পেছনে।

দরজা দিয়ে অনবরত লোক ঢুকছে। দেখতে দেখতে ভরে গেল হলটা।

'সবাই ওরা রোগী,' মুসা বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

কিশোর জবাব দেবার আগেই হলের সব আলো নিভে গেল। তেরছাভাবে একটা বৃত্তাকার আলো এসে পড়ল স্ট্যান্ড আর টুলের ওপর।

ধীরে সুস্থে হেঁটে গিয়ে মঞ্চে উঠল সারালিন। টুলটায় বসল।

'সবার শুভকামনা করছি,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে। 'আমার নাম সারালিন জুবের। আজ রাতে মনে রাখার মত কিছু ঘটনা দেখতে পাবেন আপনারা। দেখবেন, কিভাবে শুধু বিশ্বাসের জোরে বহু বছরের পুরানো রোগ, রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে ভাল হয়ে ওঠে রোগী। আমি বলব না আমি কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মানুষের মনে সুপ্ত প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলার উপায় আমি শিখেছি।'

'সুপ্ত ইচ্ছাশক্তি বলতে কি বোঝাতে চাইছে ও?' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'রোগীকে সুপার হিরোটিরো গোছের কিছু বানিয়ে দেবে নাকি?'

'চুপ করো! শুনি!'

টুল থেকে উঠে এসে মঞ্চের কিনারে দাঁড়াল সারালিন। সামনের সারির দিকে আঙুল তুলল, 'ম্যাডাম, আপনি। দেখেই বুঝতে পারছি বেদনা-রোগ আপনার। সারাতে চান?'

বকের মত গলা লম্বা করে কেউ, কেউ মোরগের মত গলা বাঁকিয়ে দেখতে চাইল কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে সারালিন। চেয়ার থেকে উঠে ক্লান্ত ভঙ্গিতে মঞ্চের দিকে এগোল এক মাঝবয়েসী মহিলা। মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ডান হাতটা লম্বা করে মহিলার মাথায় রাখল সারালিন। 'অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন আপনি। আপনার মনের ইচ্ছাশক্তি জেগে উঠুক। শক্তি জোগাক আপনাকে। দূর করে দিক যত অশান্তি।'

পিনপতন নীরবতা।

'গেছে ব্যথাটা?' জানতে চাইল সারালিন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' শোনা গেল বিস্মিত জবাব। হাসি ফুটেছে মহিলার মুখে। 'একেবারে চলে গেছে!'

দর্শকদের দিকে তাকাল সারালিন। হাত নেড়ে বলল, 'বিশ্বাসের ক্ষমতা নিজের চোখে দেখলেন আপনারা।'

'ওই মহিলার নাম মিসেস বুগার্ট, চ্যারিটি শপের মালিক,' মুসা বলল, 'বহুদিন থেকে চিনি। সারা বছরই ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়। হেন রোগ নেই, যা ওর শরীরে নেই। যেটার কথাই জিজ্ঞেস করো, বলবে, আছে। আমার ধারণা, ওর শরীরে কোন রোগই নেই। সব মানসিক।'

একের পর এক রোগী উঠে যেতে লাগল মঞ্চের কাছে। মাথায় হাতের তালু চেপে ধরে ওদের চিকিৎসা করতে লাগল সারালিন।

হঠাৎ বলে উঠল সে, 'এখানে একজন অবিশ্বাসী রয়েছে। টের পাচ্ছি আমি।'

ফিসফিস করে কিশোর বলল মুসাকে, 'তোমার কথা বলছে!'

'কেন, তুমি কি বিশ্বাসী নাকি?'

'সে একজন পুরুষ মানুষ,' সারালিন বলছে। 'সারা দেহে তার তীব্র ব্যথা, ভয়ানক যন্ত্রণা।' দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে। 'প্লীজ, আস্থা রাখুন। চলে আসুন এখানে।'

কয়েক সেকেন্ড কিছু ঘটল না। তারপর যেন গুঞ্জনের একটা ঢেউ খেলে গেল দর্শকদের মাঝে, যখন একজন লোক উঠে এগোতে শুরু করল মঞ্চের দিকে। পা টেনে টেনে চলেছে সে। হাঁটতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্টে এক এক করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। মঞ্চে উঠে একেবারে সারালিনের কাছে চলে যেতে চায়।

তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল সারালিন। ধরে ধরে নিয়ে এল মঞ্চের মাঝখানে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

'আপনার রোগ আমি সারিয়ে দেব,' সারালিন বলল। 'বহুকাল ধরে কষ্ট পাচ্ছেন বাতের ব্যথায়।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা। 'কত ডাক্তার দেখিয়েছি, কত ওষুধ খেয়েছি, কোন কাজ হয়নি।'

ওর মাথায় হাত রাখল সারালিন। 'আমি বলছি, আপনি ভাল হয়ে যাবেন!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, ধীরে ধীরে পিঠ সোজা হয়ে যাচ্ছে লোকটার। হাসি ফুটছে মুখে।

'এবার হয়েছে বিশ্বাস?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সারালিন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! হয়েছে! হয়েছে!'

'আপনার মনের জোরই আপনার রোগ সারিয়ে দিয়েছে। আর কোনদিন ভুগতে হবে না।'

হাত টানটান করল লোকটা, পা ঝাড়া দিল। 'একদম ব্যথা নেই!' মঞ্চের ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি টপকে নেমে এল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল। 'সেরে গেছে! একদম ভাল হয়ে গেছি!'

বিস্মিত গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। শুরু হলো হাততালি।

শেষ হলো মীটিং।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'কি বুঝলে?'

মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করল মুসা, 'কিছুই না!'

দরজার দিকে এগোল দু'জনে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন পুলিশ অফিসার। লোকজনকে বেরোতে দেখে চিৎকার করে বলল একজন, 'আপনারা একটু দাঁড়াবেন, প্লীজ?'

জনতার গুঞ্জন থেমে গেল।

আবার বলল অফিসার, 'আপনাদের মধ্যে মিসেস হবলগিন কোনজন?'

সম্ভ্রান্ত চেহারার মাঝবয়েসী এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে গেলেন। 'আমি। কেন?'

'আমাদের সঙ্গে আসবেন একটু?' বিনীত স্বরে বলল পুলিশ অফিসার, 'একটা দুঃসংবাদ আছে। আপনার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা। পেছনে জনতার চাপ। ক্রমাগত ঠেলা দিচ্ছে।

'এই মহিলার বাড়িও আমাদের পাড়ায়,' কোনমতে বলল মুসা। 'ডাকাতগুলো সব গিয়ে যেন আমাদের বাড়ির কাছেই আড্ডা গেড়েছে!'

সাত

পরদিন নাস্তার টেবিলে বসে দ্রুত হোমওঅর্ক শেষ করছে ডন। ফ্লোটের একটা নকশা করেছে কিশোর। মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখছেন রাশেদ পাশা।

খবরের কাগজ হাতে ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। 'এই দেখো, সামনের পাতায়ই লিখেছে। এটা নিয়ে ক'টা হলো?...চার, নাকি পাঁচটা?' স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি। 'শোনো, জানালাগুলোতেও তালা লাগানোর ব্যবস্থা করো।'

'কিসের কথা বলছ?' নকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।

'চুরি, চুরি। সমানে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে।' কিশোরের দিকে তাকালেন মেরিচাচী, 'মুসাদের ওদিকটাতেই বেশি।'

'জানি,' চাচীর দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'কি লিখেছে পত্রিকায়? পুলিশ কোন সূত্রটুত্র পেয়েছে?'

'সেই একই ব্যাপার। নিচতলার একটা জানালার কাঁচ ভেঙে ছিটকানি খুলেছে–তালা লাগাতে বলছি এ কারণেই...ঘরগুলোকে তছনছ করেছে। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করেছে। বহুক্ষণ ছিল বোঝা যায়। দামী জিনিস খোঁজাখুঁজি করেছে।' পত্রিকাটা টেবিলে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। 'বাড়িতে কেউ ছিল না বলেই বোধহয় সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করেনি চোর।'

'বাড়ির মালিকের নাম লিখেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'মিসেস হবলগিন।'

'অ, কাল রাতেই শুনেছি। তিনি ছিলেন তখন টাউন হলে, ফেইথ হীলিং মীটিঙে,' কিশোর বলল। 'মীটিং শেষ হলে পুলিশ এসে খবর দিল তাঁর বাড়িতে চুরি হয়েছে।'

'ফেইথ হীলিঙের সঙ্গে সঙ্গে যদি গণনাও জানত সারালিন, ভাল হত। চুরি যে হচ্ছে, এটা জানাতে পারত। গুণেটুনে হয়তো চোরের নামও বলে দিতে পারত।' স্যুট জ্যাকেটটা গায়ে চড়ালেন মেরিচাচী। 'আজকাল ফেইথ হীলারের চেয়ে জ্যোতিষ আর গণকদের ইনকাম অনেক বেশি।'

'সারালিন কিন্তু রোগ সারানোর জন্যে টাকা চায়নি কারও কাছে।'

হাসলেন চাচী। মাথা দুলিয়ে বললেন, 'চাইবে, চাইবে। পাবলিক মীটিং করে ক্ষমতা দেখিয়ে প্রথমে তাক লাগিয়ে দিল। অপেক্ষা কর্। খুব শীঘ্রি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখতে পাবি–রোগ সারানোর জন্যে প্রাইভেট চেম্বারে যোগাযোগ করার অনুরোধ।' দরজার দিকে এগোলেন তিনি। বেরোনোর আগে ফিরে তাকিয়ে রাশেদ পাশাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'জানালায় তালাগুলো লাগিয়ে ফেলো কিন্তু।'

'আচ্ছা,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা।

বাইরে থেকে পাল্লাটা লাগিয়ে দিলেন মেরিচাচী।

আবার নকশার দিকে চোখ ফেরালেন রাশেদ পাশা।

'কিছু কিছু আইডিয়া তো বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস মনে হচ্ছে,' কিশোরকে বললেন তিনি। 'এই যেমন, ফ্লোটটাকে জাহাজের আকৃতিতে বানানোর ব্যাপারটা। কিংবা দুর্গের মত, তার আবার টারিটও থাকতে হবে। আরও সহজ কিছু ভেবে বের করতে পারিস না?'

'যেমন?'

'একটা গ্যালাকটিক ব্যাটলশিপ,' ফোড়ন কাটল ডন, 'ক্রমাগত সেটা থেকে গোলা বর্ষণ করতে থাকবে লেজার আর সনিক ক্যাননগুলো।...আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত তোমার, কিশোরভাই। কি সব কারনিভ্ল কুইন-টুইনের প্রাগৈতিহাসিক চিন্তা তোমাদের। তারচেয়ে রবিনভাইকে মহাকাশের যুদ্ধবাজ রাজার পোশাক পরিয়ে দাওগে। ভাল লাগবে। কি করলে আরও ভাল হবে, কিছু আইডিয়া দিতে পারি আমি।'

'অনেক ধন্যবাদ,' মুখ বাঁকাল কিশোর, 'তোমার সাহায্য ছাড়াই পারব আমরা।' চাচার দিকে তাকাল সে। 'ফ্লোটটা কোন্ ভাবে বানালে ভাল হয়, তুমি কোন পরামর্শ দিতে পারো?'

'একটা কাজ করা যায়। পুরানো ধাঁচে করতে চাইছিস তো, তারমধ্যে রবিন যেহেতু আবার ম্যাজিকের ওপর জোর দিয়েছে–ফ্লোটটাকে ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ড বানিয়ে ফেললেই তো হয়। পরীর রাজ্য। হার্ডবোর্ড আর রঙিন কাগজ দিয়েই সেটা বানানো সম্ভব। রবিনের পোশাকটা হবে ঝলমলে রঙের, তাতে বড় বড় ফুল আঁকা থাকবে।'

'দূর!' হাত উল্টে সব ঝেড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল যেন ডন। 'কি সব চিন্তাভাবনা!'

ওর কথায় কান না দিয়ে চাচাকে বলল কিশোর, 'ঠিক বলেছ।' হাসি ফুটল মুখে। 'চমৎকার আইডিয়া। এক্ষুণি জানানো দরকার মুসাকে।'

*

'সত্যিই দারুণ!' মুসাও স্বীকার করল। 'আমরা যা ভেবেছিলাম, তারচেয়ে ভাল। আঙ্কেল কি বললেন, সময়মত বানানো শেষ করা যাবে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চাচা বলল কোন সমস্যা হবে না। হার্ডবোর্ডের গাছ। কাগজের পাতা, ফুল। সবুজ তেরপলে ফুল এঁকে সেটা বিছিয়ে দেয়া হবে ফ্লোটের মেঝেতে। স্কুলের ক্র্যাফট্স ডিপার্টমেন্ট এ সব জিনিস সাপ্লাই করতে পারবে। বানালে দারুণ হবে।'

লাঞ্চের সময় উডওঅর্ক স্টুডিওতে গিয়ে ওখানকার ইন-চার্জ মিস্টার রডরিগের সঙ্গে দেখা করল দু'জনে। ওদের পরিকল্পনার কথা জানাল। তারপর গেল আর্ট ডিপার্টমেন্টে মিস্টার উইলিয়ামসের সঙ্গে কথা বলতে। ফ্লোটের ডেকোরেশন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করল।

ক্যানটিনে ফিরে আসছে দু'জনে, এই সময় দেখল ডনকে। দুই হাত পকেটে। তীব্র ভ্রূকুটিতে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

'কি হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল কিশোর।

'তোমাদের ওই স্টুপিড ফেসটিভ্যাল! আমার বিশ্বাস, এটার জন্যেও তোমরা দায়ী। তোমরাই পরামর্শ দিয়েছ।'

'কোনটার?'

'স্কুলের তরফ থেকে একটা স্টল খোলা হবে। তাতে দান-খয়রাতের জিনিস বিক্রি হবে। টাউন হলের বাইরে যেখানে গিয়ে শেষ হবে মিছিলের যাত্রা, সেখানে খোলা হবে স্টল।' গুঙিয়ে উঠল ডন। 'আমাকে বাছাই করা হয়েছে বিক্রেতাদের সাহায্য করার জন্যে। সারাক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা আর জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়া...এই জঘন্য কাজ করতে কারও ভাল লাগে? স্যারকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, চ্যারিটি শপের চেয়ে বরং একটা চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচের ব্যবস্থা করা হোক। কিছুতেই শুনলেন না।'

হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এখন তোমাকে কি করতে বলা হয়েছে?'

'এখন কিছু না। স্কুল ছুটির পর দেখা করতে বলেছেন। নিশ্চয় স্টুপিডের মত আবার কোন পরামর্শ দিতে থাকবেন। শুনলাম, দোকানে বিক্রির জন্যে প্লাস্টার অভ প্যারিসের জিনিস বানাতে বলবেন। কি করে বানাতে হয়, শিখিয়ে দেবেন।'

'আমাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি বা মুসা এ সবের কিছু জানি না। কিন্তু প্লাস্টার অভ প্যারিস দিয়ে জিনিস বানানোর কাজটা তো আকর্ষণীয়ই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'হতে পারে, তোমাকে ভিনগ্রহবাসীদের প্রতিকৃতি বানাতেই বলে দেবেন স্যার,' মুসা বলল।

'ইয়ার্কি মারছ!' মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে ইয়ার্কি মারার কোন লক্ষণ না দেখে উজ্জ্বল হলো ডনের মুখ। 'তোমার কি সেরকমই মনে হচ্ছে? ভিনগ্রহবাসী বানাতে বলবেন?'

'অসুবিধে কি? তুমিও তো স্যারকে পরামর্শ দিতে পারো,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, তা পারি!' ভ্রূকুটি দূর হয়ে গেল ডনের। বোধহয় মহাকাশবাসী বুদ্ধিমান জীব আর দানবের উদ্ভট চেহারা কল্পনা করতে করতেই সরে গেল ওখান থেকে।

'রবিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আজ?' ক্যানটিনে চেয়ারে বসতে বসতে মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হয়েছে। তবে বিশেষ কথা হয়নি। টমের সঙ্গে ম্যাজিক নিয়ে আলাপ করছিল। উৎসবে দেখানোর জন্যেই মনে হয়।'

'টমকে বলেছ কাল রাতে টাউন হলে ওর মায়ের ডাক্তারি দেখতে গিয়েছিলাম আমরা?'

'সুযোগ পাইনি।'

'হুঁ। রাতে কিছু ভেবেছ এ নিয়ে?' মুসার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে কিশোর বলল, 'আমি শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না।

তোমার কি ধারণা? এ ভাবে সত্যি সত্যি রোগ সারানো সম্ভব?'

'ঘাপলা-টাপলা কিছু আছে বলে তো বুঝলাম না। কিন্তু না বুঝলেই যে ব্যাপারটা সত্যি হবে তারও কোন মানে নেই। আমি আশা করেছিলাম, ডাইনীর পোশাক পরে, কিংবা ঢোলা আলখেল্লা আর মানুষের হাড় হাতে হাজির হবে সারালিন।...কিভাবে কি করেছে তুমিই যখন ধরতে পারোনি, আমি কি করে পারব?' চিন্তিত ভঙ্গিতে রোল-এ কামড় বসাল মুসা। 'এক কাজ করা যেতে পারে। ওদের দোকানটায় গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে আসা যায়। কোন সূত্র মিলে যেতে পারে।'

'আমিও এ কথাটাই ভাবছি। দোকানটা চেনো?'

'দোকান চিনি না, তবে কোন্ জায়গাটায় আছে অনুমান করতে পারছি। ম্যানার স্ট্রীটের শেষ মাথায় গির্জাটার কাছে। বেশ কয়েকটা অ্যানটিক শপ আছে না, ওখানটায়। চিনে নিতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। আজ স্কুল ছুটির পরেই যাওয়া যায়, কি বলো?'

'হ্যাঁ, যায়,' কিশোর বলল।

'টম ছোঁড়াটাকে যেমন পছন্দ হয়নি আমার, ওর মা'টাকেও না। চিটিংবাজিটা ফাঁস করে দিতে পারলে ভাল হত।'

'দেখা যাক কি করা যায়।'

আট

গির্জার আশেপাশের এলাকাটা কিশোরের খুব পছন্দ। এখানে ঢুকলেই মনে হয় এক লাফে বর্তমান যুগ পেরিয়ে কয়েকশো বছর আগেকার ভিক্টোরিয়ান যুগে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

ম্যানার স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা। লম্বা, সরু সরু বাড়িগুলোর মাঝে প্রচুর গলিপথ, ছায়ায় ঢাকা, অন্ধকার।

'এই যে এটাই হবে,' একটা ছোট দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। বোতলের কাঁচের মত দুটো সবজে রঙের জানালার মাঝের দরজার ওপরে লেখা রয়েছে

দি জুবের'স ওয়ে

'এঁহ্, জুবের'স ওয়ে!' নাক কুঁচকাল মুসা। 'রাখা উচিত ছিল আসলে চিট'স ওয়ে।'

'ওদের ওপর সাংঘাতিক খেপে আছ তুমি,' মুচকি হাসল কিশোর। 'এসো।'

দরজার গায়ে একটা ছোট সাইনবোর্ড লাগানো। তাতে লেখা:

দোকানের মালিকানা বদল হয়েছে।
ক্রেতাসাধারণকে স্বাগতম।

জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। একধারে নানা রকম বোতল, বয়াম আর শুকনো শেকড়-বাকড়-ফুল রাখা। আরেক পাশে ডাইনী আর কল্পিত দানবের অনেকগুলো মুখোশ এবং বেশ কতগুলো বাক্স। নিশ্চয় ম্যাজিক দেখানোর সরঞ্জাম রয়েছে ওগুলোতে।

'দোকানটা দেখে মনে হচ্ছে চার্লস ডিকেন্সের দা ওল্ড কিউরিওসিটি শপ,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'বোঝার মত কিছু বলো,' হাত তুলল মুসা। 'তুমি জানো, আমি ডিকেন্স পড়িনি।'

হাসল কিশোর। 'টেলিভিশন তো দেখো। কাহিনীটা নিয়ে সিরিয়াল করেছে। তাতে লিটল নেল নামে একটা মেয়ে...'

'থাক, থাক, গল্প শোনার ধৈর্য নেই এখন,' বাধা দিল মুসা। 'লেকচার শুরু করলে আর তো থামতে চাইবে না। এখানে রাত কাটাতে আসিনি আমরা। যা দেখার দেখে তাড়াতাড়ি কেটে পড়া ভাল। ঢুকে পড়ব নাকি?'

'বাধা তো দেখছি না।'

ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। টুংটাং করে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। বাতাসে ধূপের কড়া গন্ধ। আড়াল থেকে মৃদু শব্দে বাজছে উচ্ছল বাজনা। সারি সারি তাক আর বেশ কয়েকটা আলমারি আছে। তাকগুলোতে রাখা হ্যালোউইন কস্টিউম, ম্যাজিকের সরঞ্জাম, শেকড়-বাকড়-ভেষজ ওষুধ, হোমিওপ্যাথি আর অ্যারোমাথেরাপির ওপর কয়েকটা পেপারব্যাক চটি বই আর কিছু বিচিত্র জিনিস যেগুলো চিনতে পারল না ওরা। লম্বা একটা আলমারি সীম আর সিয়ারিয়ালের প্যাকেটে বোঝাই।

দোকানের শেষ মাথায় একটা লম্বা কাউন্টার। তার ওপাশে বসে আছে সারালিন জুবের। কি যেন পড়ছিল। ছেলেরা ঢুকতে মুখ তুলে তাকিয়েছে। দোকানে আর কোন খরিদ্দার নেই।

'কিছু লাগবে?' জানতে চাইল মহিলা।

'দেখি আগে,' জবাব দিল কিশোর। 'পছন্দ হলে বলব।'

দেখার মত জিনিসের অভাব নেই। একটা ঘূর্ণায়মান তাকে রাখা কতগুলো অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল তার। নিশ্চয় ছোটখাট ম্যাজিক দেখানোর সরঞ্জাম। বাচ্চাদের জন্যে।

'এগুলো পেলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে ডন,' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।

রবারের মাকড়সা আছে, নাড়া লাগলেই পা কিলবিল করে ওঠে। ম্যাজিক সোপ আছে। দেখতে সাধারণ সাবানের মতই। কিন্তু মুখ ধুতে গেলে কালি লাগার মত কালো হয়ে যাবে মুখ। প্লাস্টিকের তৈরি চকলেট আছে। আসল চকলেটের মত দেখতে। মুখে না দিলে বোঝা যাবে না ওগুলো প্লাস্টিক। চিনির টুকরো আছে। চায়ের কাপে দিয়ে গোলাতে গেলে বেরিয়ে আসবে ভেতরে লুকানো রবারের কালো রঙের মরা মাছি। কাউকে ঠকাতে কিংবা ভয় দেখানোর জন্যে এ সবের তুলনা হয় না।

'ডনকে বোলো না,' সাবধান করে দিল মুসা। 'কোনমতে খোঁজ পেলে সব এসে কিনে নিয়ে যেতে চাইবে। পয়সা চেয়ে চেয়ে জান জ্বালিয়ে খাবে।'

বয়ামে রাখা ভেষজ ওষুধের একটা তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে।

'মুখ খুলে শুঁকে দেখো,' সারালিন বলল। 'অনেক কাজে লাগে। একটার সঙ্গে আরেকটা ঠিকমত মিশিয়ে নিতে পারলে মাথা ব্যথা, দাঁত ব্যথা আর পেট ব্যথায় ধন্বন্তরির কাজ করে।'

একটা বয়ামের মুখ খুলে শুঁকল কিশোর। মৌরির তীব্র গন্ধ। সারালিনকে জিজ্ঞেস করল, 'যেমন?'

'পুরানো আমলে তো ভেষজ ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করত লোকে। প্রতিটি রোগের প্রাকৃতিক প্রতিষেধক ছিল। লবঙ্গ ব্যবহার করা হত দাঁত ব্যাথায়, পেট ব্যথার জন্যে পেপারমিন্ট। এমনি নানা রোগে নানা ওষুধ,' হাসল সারালিন। 'বহুকাল হলো, আমাকে আর ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি।'

'যে কোন রোগ সারাতে পারে?' বিশ্বাস হচ্ছে না মুসার।

'প্রায় সব।'

'ভাঙা পা জোড়া লাগাতে পারে?'

'পা ভাঙাটা কোন রোগ নয়,' হাসি মলিন হলো না সারালিনের।

'কি জানি। আমি তো ভাবতাম হাড় ভাঙাটাও রোগ। ব্যথায় যে রকম চেঁচামেচি করতে থাকে রোগী...'

'পা কেটে গেলেও তো রোগী চেঁচায়। তাই বলে সেটা কি রোগ?'

'না, তা অবশ্য নয়...'

'আসলে আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিলে, তাই না? তোমার কোন দোষ নেই। আজকাল লোকে আর এ সবের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। রোগ হলেই ডাক্তারের কাছে ছোটে।'

'কাল রাতে আপনার মীটিঙে গিয়েছিলাম আমরা,' কিশোর বলল। 'রোগ সারাতে কাল ভেষজ ওষুধও লাগেনি আপনার।'

'কেউ কেউ বিশেষ ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়। আমিও সেই ভাগ্যবানদের একজন।'

'আসলেই আপনি ওষুধ ছাড়া জটিল রোগ সারাতে পারেন?'

'সেটা নির্ভর করে রোগীর মনের জোরের ওপর।'

'যদি কারও সে-জোর না থাকে?'

হাসিটা এতক্ষণে মলিন হলো সারালিনের। 'বিশ্বাস আর মনের জোর ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়।'

'কেউ যদি আপনার এই জবাবের মধ্যে ফাঁকিবাজি দেখতে পায়, কি বলবেন?'

'মানে?' হাসিটা পুরোপুরি উধাও হয়ে গেল মহিলার।

'দেখতে পেলেও কেউ অবশ্য আপনাকে ফাঁকিবাজ প্রমাণ করতে পারবে না। রোগ সারলে বলবেন আপনার কৃতিত্ব, না সারলে রোগীর দোষ; ভুল বললাম?'

জবাবটা এড়িয়ে গেল সারালিন, 'বহু লোকের পুরানো বেদনা-রোগ সত্যি সত্যি সারিয়ে দিয়েছি আমি।'

'আপনার ঝাড়ফুঁকেই যে সেরেছে, তার কি প্রমাণ আছে?'

হাত নাড়ল সারালিন, 'দেখো, এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না আমি।'

'কিছু মনে করবেন না, আমি শুধু...'

উঠে দাঁড়াল সারালিন। 'কিছু কিনবে নাকি তোমরা?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। 'দোকান বন্ধ করব আমি।' কপাল টিপে ধরল। 'মাথা ধরেছে।...না কিনলে নেই...অন্য কোনদিন সময় করে এসো। কথা বলা যাবে।'

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ছিটকানি লাগিয়ে দিল সারালিন। জানালার খড়খড়ি নামিয়ে দিল।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'তোমার প্রশ্নের তোড়ে ঘাবড়ে গেল নাকি?'

'না ঘাবড়ালেও রেগেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'মুখের ওপর কাউকে ঠগ, মিথ্যুক বললে রেগে যাবারই কথা।'

'ঠিকই তো বলেছি। ও যা, তা-ই বলেছি। রাগে রাগুকগে। মাথা ধরেছে তো বিশ্বাস দিয়ে সারায় না কেন? নিজের মনের জোর কম নাকি? আমি শিওর, ভেষজ-ফেষজ বাদ দিয়ে এসপিরিন গিলছে এখন। চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।'

পাশের একটা দোকান থেকে বেরিয়ে এল এক মহিলা। জুবেরদের দোকানের দরজায় 'বন্ধ' লেখা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখে আফসোস করে বলল, 'এহ্হে, বন্ধ করে ফেলল!'

কিশোর বলল, 'ইচ্ছে করলে এখনও দেখা করতে পারেন।'

'নাহ্, তেমন জরুরী কিছু না। পাশের ওই যে দোকানটা দেখছ, ওটা আমার। একটু আগে ডাকপিয়ন ভুল করে জুবেরের দোকানের চিঠি আমার দোকানে দিয়ে চলে গেছে,' একটা চিঠি দেখাল মহিলা। 'আমিও ছিলাম ব্যস্ত, খেয়াল করিনি। পরে দেখতে গিয়ে দেখলাম আমার চিঠি না।...এই যে দেখো, ঠিকানা লেখা থারটি ফাইভ, ম্যানার স্ট্রীট। আমারটা তেত্রিশ। মাঝে আরেকটা দোকান। ওপরে নাম যা-ই দিয়ে থাকুক, নম্বর মিলে যাচ্ছে; জুবেরদের চিঠিই এটা। এই পিয়নগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না। চোখের মাথা খেয়ে বসে থাকে!' চিঠিটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার তাড়া আছে। এটা মিসেস জুবেরকে দিতে পারবে, প্লীজ?'

'নিশ্চয় পারব,' সাগ্রহে হাত বাড়াল কিশোর।

চিঠিটা দিয়ে তাড়াহুড়া করে চলে গেল মহিলা।

খামের ওপরে লেখা ঠিকানা দেখল কিশোর। রিয়ারসাইড কাউন্টির জনৈক কে· ডিকির ঠিকানায় গিয়েছিল প্রথমে। সেখানে তাকে না পেয়ে ঠিকানা কেটে রকি বীচে জুবেরদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।

মুখ তুলে তাকাল কিশোর। যে মহিলা চিঠি দিয়ে গেছে সে অনেক দূরে চলে গেছে।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি?' জানতে চাইল মুসা।

'ঠিকানা। প্রথমে রিয়ারসাইড কাউন্টিতে গিয়েছিল।'

'তাতে আশ্চর্যের কি হলো? ওখান থেকেই তো এসেছে টমেরা।'

'না। ওরা বলেছে রিভারসাইড কাউন্টি থেকে এসেছে। রিয়ারসাইড কাউন্টি নয়।'

'হয়তো ভুল শুনেছ। টমের উচ্চারণের কারণেও ওরকম শোনা যেতে পারে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, ও রিভারসাইড কাউন্টিই বলেছে। আমি শিওর।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল সে। 'আরও একটা ব্যাপার, চিঠিটা কে· ডিকির নামে এসে থাকলেও ঠিকানা দিয়েছে জুবেরদের দোকানের।'

'তাতে কি? কে· ডিকি হয়তো নতুন এসেছে এখানে। পার্মানেন্ট ঠিকানা নেই। জুবেরদের পরিচিত, তাই তাদের ঠিকানাতেই চিঠি এসেছে। ঠিকানা কেটে পরে পাঠিয়েছে চিঠিটা যে, সে জানে কে· ডিকি এখন কোনখানে থাকে। সেই লোক রিয়ারসাইডে বাস করলেও জুবের আর কে· ডিকি, দু'জনকেই চেনে। এক শহরের লোক কি আরেক শহরের লোককে চিনতে পারে না?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। কি যেন ভাবতে ভাবতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। মুসার দিকে তাকাল সে। 'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমি, মুসা।'

'কি রহস্য?'

'জানি না এখনও। তবে জেনে যাব শীঘ্রি।'

নয়

'মনে তো হচ্ছে সব ঠিকঠাকমতই চলছে,' মিস ওয়ান্ডারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন হেড টীচার মিস হ্যামিলটন। 'কোন অসুবিধে হলে বলবেন। সব রকম সহযোগিতা পাবেন আমার কাছ থেকে।'

ফেসটিভ্যাল কমিটির সদস্যদের ভরসা আর উৎসাহ দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

'যাক, আমাদের জন্যে আরও সুবিধে হলো,' মিস ওয়ান্ডার বললেন। 'এখন কথা হলো, দায়িত্ব তো আরও কিছু বাকি রয়ে গেছে। এই যেমন, ভিডিও রেকর্ডিংটা কে করবে?'

ছাত্রছাত্রীরা চুপ করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। ওরা চাইছে, সিদ্ধান্তটা তিনিই দিন।

'গতবার কেরি করেছিল,' আবার বললেন তিনি। 'ভালই করেছিল। তবে এবার অন্য কাউকে চান্সটা দিতে চাই। বিড, তুমি করবে নাকি?'

'সরি, ম্যাডাম। ক্যামেরার ব্যাপারটা ভাল বুঝি না আমি।'

কিশোরের দিকে তাকালেন মিস ওয়াল্ডার, 'কিশোর, তুমি?'

'আমার তো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ম্যাগাজিনের লেখার কাজটাও তো আমার ঘাড়ে পড়েছে।'

'কে দিল?'

'কেরি।'

'আমি ভেবেছিলাম এবারও ভিডিও করার দায়িত্ব পড়বে আমার ওপর,' কৈফিয়ত দিল কেরি। 'তাই লেখার কাজটা কিশোরকে করতে বলেছিলাম। কিন্তু এখন তো আর আমাকে ভিডিও করতে হচ্ছে না, আমিই লিখতে পারব। ও ছবি তুলুক।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসল সে। 'কি, খুশি তো?'

কেরির ঝাঁজ মেশানো কর্তৃত্বভরা কণ্ঠকে উপেক্ষা করল কিশোর। মিস ওয়াল্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ভিডিওর দায়িত্ব আমি নিলাম।'

'আগেই প্র্যাকটিস করে নিও। ক্যামকর্ডার চালাতে যদি কোন অসুবিধে হয়, কেরিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। কেরি, কিশোরকে সাহায্য কোরো।'

আবার তিক্ত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল কেরি। হ্যাঁ-না কিছু বলল না।

এরপর কাজের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে জানতে চাইলেন মিস ওয়াল্ডার। এক এক করে কাজের ফিরিস্তি দিতে লাগল সদস্যরা। ক্যানভাসে আঁকার কাজ ভালই এগিয়েছে। গাছ বানানো প্রায় শেষ করে এনেছে উডওঅর্ক ডিপার্টমেন্ট। পোশাক তৈরি এখনও অনেকটাই বাকি, এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষ করে রবিনের রানীর পোশাক বানানো। তবে যারা দায়িত্বে আছে, তারা কথা দিল, উৎসবের আগে শেষ করে ফেলবে যেভাবেই হোক।

জুবেরদের ঠিকানায় আসা কে· ডিকির চিঠির কথা রবিনকে বলার সুযোগ পায়নি এখনও কিশোর। মুসার সঙ্গে ঠিকানাটা নিয়ে সকালেও আলাপ হয়েছে। কিশোরের ধারণা, কোন কারণে নামের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছে টম। রকি বীচে আসার আগে ছিল রিয়ারসাইড কাউন্টিতে, বলেছে রিভারসাইড কাউন্টি। উচ্চারণের ভুল নয়, ইচ্ছে করেই বলেছে সে।

'এটা অবশ্য তেমন কোন অপরাধ নয়,' তর্কের খাতিরে মুসাকে বলেছে কিশোর। 'এক জায়গায় থেকেছে টমরা, বলেছে আরেক জায়গার নাম, একে কি অপরাধ ধরা যায়?'

'তা যায় না,' মুসা বলেছে, 'তবে মিথ্যে কথা বলেছে সে। ওরকম একটা মিথ্যুকের সঙ্গে রবিনের মেলামেশাটা আমি ভাল চোখে দেখতে পারছি না।'

মীটিং শেষে ক্যানটিনে চলল তিন গোয়েন্দা।

'ক্যামকর্ডার কেরির হাতছাড়া হয়ে গেল বটে,' হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন, 'তবে ম্যাগাজিন থেকে তোমাকে পুরোপুরি বের করে দিতে পেরে

খুশিও হয়েছে।'

'হয় হোকগে,' জবাব দিল কিশোর। 'একসাথে সব কাজ তো আর আমি করতে পারব না। বসে লিখে লিখে হাত ব্যথা করার চেয়ে ভিডিও করা অনেক আনন্দের।'

'আমিই নিশ্চয় প্রাধান্য পাব বেশি,' হেসে বলল রবিন। 'প্রচুর ক্লোজ-আপ নেয়া হবে, যেহেতু রানী। এ বছরের জন্যে স্টার বানিয়ে দিলে আমাকে।'

'ভালয় ভালয় যদি উতরে দিতে পারো,' মুসা বলল, 'একটা কাজের কাজ হবে। পত্রিকাওলারাও প্রচুর লেখালেখি করবে তোমাকে নিয়ে। স্কুলের সুনাম হবে।'

দরজা ঠেলে ক্যানটিনে ঢুকল ওরা।

'ওই যে টম,' রবিন বলল। 'চলো, ওর টেবিলে গিয়েই বসি।'

খাবারের ট্রে হাতে টমের কাছে চলে এল তিনজনে। ট্রেগুলো টেবিলে রাখল।

'মীটিং কেমন হলো?' জানতে চাইল টম। 'সব ঠিক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ,' রবিন জানাল। 'ভিডিওর দায়িত্ব পেয়েছে কিশোর।'

'ভাল। ক্যামকর্ডার চালাতে জানো তো ঠিকমত? কোন সমস্যা হলে আমাকে বোলো, দেখিয়ে দেব। বাবা যখন থিয়েটারে কাজ করত, কতবার তার ছবি তুলেছি।'

'অ, ক্যামেরাও চালাতে জানো,' ব্যঙ্গের সুর বেরোল মুসার কণ্ঠ থেকে। 'সব বিষয়েই তোমার ট্যালেন্ট দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। অবশ্য তোমাদের পুরো পরিবারটাই ট্যালেন্টেড।'

টেবিলের নিচ দিয়ে মুসার পায়ে লাথি মারল কিশোর। থামল না মুসা। 'থিয়েটারে কি কাজ করত তোমার বাবা? অভিনয়?'

'হ্যাঁ। রিভারসাইডে তো বিরাট সুখ্যাতি ছিল তার। প্রচুর ভক্ত ছিল।'

'তাই নাকি? কই, কোনদিন তো কোন পত্রিকায় তার ছবি দেখিনি। নামও শুনিনি।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল টমের দৃষ্টি। 'এত দূর থেকে তার নাম তোমাদের শোনার কথা নয়। তা ছাড়া ভিন্ন একটা নাম নিয়েছিল বাবা। সিনেমা-থিয়েটারের লোকেরা আসল নাম বাদ দিয়ে অন্য নাম নেয় না, ওরকম।' পকেট থেকে একটা পয়সা বের করল সে। 'দেখো।'

পয়সাটা এ হাত থেকে ও হাতে চালাচালি করল কয়েকবার। তারপর মুখে ফেলল। দাঁতে কামড়ে ধরে রাখল একটা মুহূর্ত। মুখের ভেতরে নিয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলল। ঢোক গিলে বোঝাল পয়সাটা গিলে ফেলেছে। দুই হাত দেখাল। কোন হাতেই নেই। তারপর মুসার কানের পেছন থেকে বের করে আনল ওটা।

হেসে উঠল রবিন। হাততালি দিল।

মুসাও হাসল। 'অনেক ম্যাজিক শিখেছ তুমি। শেয়ালের মত চালাক।'

টমও হাসল। কিন্তু চোখে অস্বস্তি।

'ফেসটিভ্যালের জন্যে ও আমাকে ম্যাজিক শিখিয়ে দেবে বলেছে,' রবিন বলল।

'লোকে কি এ সব ম্যাজিক দেখতে পাবে?' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। 'তুমি থাকবে ফ্লোটের ওপর। রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষকে দেখাবে কি করে?'

'ঠিকই বলেছ,' টম বলল। 'এ ধরনের ম্যাজিক চোখেই পড়বে না লোকের।'

'তাহলে কি করা যায়?' রবিন বলল, 'একটা কিছু করতে চাই আমি। সারাক্ষণ একভাবে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থেকে লোকের দিকে হাত নাড়তে ভাল লাগবে না।'

'বল ছুঁড়তে পারো,' সমাধান দিয়ে দিল টম। 'সেটা ঠিকই দেখতে পাবে লোকে।' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'আমার আম্মা বল ছোঁড়ায় ওস্তাদ। তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারবে। আমিও জানি। তবে ওস্তাদী করার মত পারি না।'

'তাহলে তা-ই শিখব!'

'অত সহজ না। প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার এর জন্যে। সময় তো বেশি নেই আর।'

চোখ জ্বলজ্বল করছে রবিনের। চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিল এটাকে। 'আমাকে দেখিয়ে দাও, ঠিক পারব। মন দিয়ে করতে থাকলে কোন কাজ পারা যায় না এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল টম। 'আমার কাজ আছে। পরে দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টম। ওর দিকে তাকিয়ে থেকে রবিন বলল, 'ও একটা অসাধারণ ছেলে, তাই না?'

'ভাল অর্থে না খারাপ অর্থে?' ফস করে বলে বসল মুসা।

'মানে!'

'মাত্র কদিন আগে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমার। ভাল করে চেনোই না। ওর মুখের কথা বিশ্বাস করেই কেবল ওর সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ...'

'মুসা, থাক,' বাধা দিতে গেল কিশোর।

মুসার দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'তুমি যাই বলো না কেন, টম খুব ভাল ছেলে।'

'টমের সব কথা বিশ্বাস করা তোমার ঠিক হচ্ছে না। এই যে বলে গেল, রিভারসাইডে ওর বাপ বিরাট অভিনেতা ছিল, আসলে কি তাই? কেউ শুনল না কেন তাহলে তার নাম?'

'বলল যে শুনলে না আসল নাম ব্যবহার করেনি ওর বাবা।'

'শুনেছি। তাহলে অন্য যে নামটা ব্যবহার করত, সেটা জানাল না কেন আমাদের? প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে পয়সা বের করে ম্যাজিক দেখানো শুরু করল। বুঝিনি ভেবেছ?'

রেগে গেল রবিন। 'টমকে তোমরা শুধু শুধু সন্দেহ করছ। উচিত হচ্ছে না। কেন ওকে পছন্দ করতে পারছ না, বুঝছি না আমি। কিন্তু ও খারাপ নয় মোটেও। যতই বলো, আমি বিশ্বাস করব না।'

'ওই আলোচনাটা বাদ দাও না এবার!' ওদের থামানোর জন্যে বলল কিশোর। 'বাইরের একটা ছেলেকে নিয়ে এ ভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধানোটা কি ঠিক হচ্ছে?'

মুসা চুপ হয়ে গেল। নরম হয়ে এল রবিন।

'রবিন,' আবার বলল কিশোর, 'এই চুরির ব্যাপারটা নিয়ে একটা তদন্ত চালাব ভাবছি। আলোচনায় বসতে চাই।'

'সরি। আজ আমার সময় হবে না। ব্যস্ত থাকব।'

খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়ে উঠে চলে গেল রবিন।

মুসা বলল, 'চিঠির কথাটা ওকে বললে না কেন?'

'লাভ হত না। রবিন যে ভাবে টমদের সাপোর্ট করছে, সন্দেহের কথাটা বোঝাতে পারতাম না ওকে। তোমার ওভাবে ওকে রাগানো ঠিক হয়নি।'

'কি করব? টমকে যেভাবে ভাল বলতে লাগল...'

'বলুক। সময় হলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। অন্যকে নিয়ে অহেতুক ঝগড়া করে আমাদের নিজেদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরানোটা হবে মস্ত বোকামি।'

'কিন্তু আমার কি কোন দোষ ছিল?'

'ছিল। তোমাদের দু'জনেরই দোষ। দু'জনেই অতিরিক্ত তর্ক করছ ক'দিন থেকে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো।'

'কোথায়?'

'বাড়ি যাবে না? ক্যান্টিনেই বসে থাকবে নাকি?'

মাঠের মধ্যে দিয়ে এগোনোর সময় ডনের সামনে পড়ল কিশোর। ডনের সঙ্গে রয়েছে তার দু'জন বন্ধু। ফুটবলে লাথি মারছে। ডনের মেজাজ খারাপ। কিশোরকে দেখেই বলে উঠল, 'আজকাল সবার হয়েছে কি, বলো তো, কিশোরভাই? সবাই যেন কেমন খেপে গেছে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বিষ বলয়ে ঢুকল নাকি পৃথিবী?'

'কি হয়েছে?'

'যত নষ্টের মূল ওই জঘন্য ফেসটিভ্যাল,' গজগজ করে বলল ডন। 'ওদেরকে বললাম স্টোরে বিক্রির জন্যে ভিনগ্রহের বাসিন্দা আর দানব বানাতে। ভয়ানক ভয়ানক সব দানবের চেহারাও বর্ণনা করলাম। কিন্তু আমার কথা শুনলই না। ওরা বলে ব্যাঙ, বিড়াল, ইঁদুর বানাতে। এ কোন জিনিস হলো? আমাকে দিয়েছে আরও খারাপ জিনিস বানাতে। ভূত।'

'ভূত? ভালই তো। দানবের কাছাকাছিই চেহারা হবে নিশ্চয়।'

'তোমার কথাও তো ওদের মতই!' ঝাঁজিয়ে উঠল ডন। 'কোথায় ভিনগ্রহের দানব, আর কোথায় মাটির তলার ভূত, নৌম। খেয়ে আর কাজ পেল না!' রাগটা ঝাড়ল ফুটবলের ওপর। ধাঁ করে এক লাথি মেরে ওটাকে পাঠিয়ে দিল মাঠের কিনারে। ওর দুই বন্ধু আটকাতে পারল না। 'নৌম-ফৌম

দু'চোখে দেখতে পারি না আমি!'

দশ

কিছু একটা করা দরকার, বুঝতে পারছে কিশোর। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, রবিনের সঙ্গে খিটিমিটিটা বাড়বেই মুসার। সেটা বন্ধ করতে হলে টমের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। হয় প্রমাণ জোগাড় করতে হবে যে সে মিথ্যে কথা বলছে, নয়তো নিশ্চিত হতে হবে ওরা ভুল করছে।

টমের বাবার বিরুদ্ধে খারাপ কিছু জানা যায়নি এখনও। ম্যাজিক দেখানো খারাপ কিছু না, কিংবা অপরাধ নয়। হয়তো সত্যিই রিভারসাইডে নাটকে অভিনয় করত সে। ভিন্ন নামে। অসম্ভব নয়।

টমকে জিজ্ঞেস করে সুবিধে হবে না। বরং তার মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাতে কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।

আবার যেতে পারে দোকানটায়। কায়দা করে আলাপ চালাতে পারে সারালিনের সঙ্গে। একজন ম্যাজিশিয়ানের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে গেলে সন্দেহ জাগার কোন কারণ নেই। জানার চেষ্টা করবে, সত্যি ভিন্ন নামে অভিনয় করত কিনা মহিলার স্বামী। রকি বীচে আসার আগে কোন্ জায়গায় থাকত, সেটাও হয়তো জানা যাবে।

মুসাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। উল্টোপাল্টা কথা বলে সব ভজঘট করে দিতে পারে সে। গেলে একাই যেতে হবে। ডনের জন্যে জিনিস কেনার ছুতো করে।

সেদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর বাস ধরে আবার ম্যানার স্ট্রীটে চলে এল কিশোর।

বাস থেকে নেমে রাস্তার মোড় ঘুরছে, এই সময় একটা লোকের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল তার। সেই বেতো লোকটা, টাউন হলে যার ব্যথা সারিয়ে দিয়েছিল সারালিন, গটগট করে হেঁটে চলে যাচ্ছে রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে।

ওই লোকটাই, কোন সন্দেহ নেই। এমন ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে, যেন কোনকালে বাতের ব্যারাম ছিল না তার।

অবশ্য সারালিন বলেছে কোনদিন আর বাতে কষ্ট পেতে হবে না তাকে।

সত্যি কি ভাল করে দিয়েছে?

আসলেই কি অসুখ ছিল লোকটার?

মোড়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল সে। গাঁট্টাগোট্টা শরীর, মাঝবয়েসী, মাথাভর্তি চুল, সরু, চ্যাপ্টা লম্বাটে মুখ, ঠেলে বেরুনো চোয়াল আর খাড়া নাক। রাতে অল্প আলোয় এত ভাল করে দেখতে পারেনি। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন অর্ধভুক্ত একটা ব্লাডহাউন্ড খাবারের সন্ধানে চলেছে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। লোকটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে সারালিনের দোকানের সামনে। জানালা দিয়ে উঁকি দিতে লাগল। দোকান থেকে বেরিয়ে এল স্বয়ং গ্রেট মিসটিরিয়োসো। কথা বলতে লাগল লোকটার সঙ্গে।

কয়েক মিনিট পর দোকানে তালা লাগিয়ে লোকটার সঙ্গে হেঁটে চলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো।

সন্দেহ জাগল কিশোরের। একে অন্যকে চেনে ওরা। কি করে চিনল? ফেইথ হীলিং মীটিঙে সেদিন উপস্থিত ছিল না জুবের। দেখা হওয়ার কথা নয়। তাহলে চিনল কিভাবে?

একটাই জবাব, সাজানো নাটক ছিল ঘটনাটা। লোকটা বাতের রোগী ছিল না। দর্শকদের সামনে অসুস্থতার ভান করেছে। অভিনয়।

সারালিনের সঙ্গে কথা বলা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাস ধরে বাড়ি ফিরে এল কিশোর। মুসাকে ফোন করল স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলে আসতে। জরুরী কথা আছে।

মুসা বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাবে।

ফোন সেরে রান্নাঘরে ঢুকল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল ডন। মুখে, হাতে, সাদা সাদা কি যেন লেগে আছে। টেবিলে বসে চীনা মাটির পাত্রে মেরিচাচীর সবচেয়ে প্রিয় কাঠের হাতাটা দিয়ে কি যেন ঘুঁটছে।

'কি করছ?'

'নৌম বানাচ্ছি,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল ডন।

'চাচীর জিনিস চাচীকে বলে নিয়েছ?'

ডনের জামার সামনেটা সাদা জিনিসে মাখামাখি। ওই একই জিনিস অনেকখানি পড়ে আছে মেঝেতেও।

'খালা কিছু বলবে না। কিসে নিয়ে ঘুঁটব?'

শঙ্কিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'চাচী তোমাকে খুন করবে! কি পরিমাণ নোংরা করেছ দেখো!'

নিজের দিকে তাকাল ডন। 'মুছে ফেললেই হবে।' আরও জোরে জোরে ঘুঁটতে লাগল সে।

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'করছটা কি তুমি?'

বাটির পাশে রাখা একটা থকথকে নরম প্লাস্টিকের মূর্তি তুলে দেখাল ডন। কল্পিত নৌমের ছবির সঙ্গে মিল আছে। 'এটা হলো ছাঁচ। বাটিতে এই যে প্লাস্টার ঘুঁটছি, এটা ঢেলে দেব ছাঁচের মধ্যে। শক্ত হয়ে গেলে ছাঁচটা দু'দিক থেকে টেনে খুলে ফেলব। ব্যস, নৌম তৈরি হয়ে যাবে।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'বানাতে পেরেছে একআধটা?'

মাথা নাড়ল ডন। টেবিলে রাখা একটা প্লাস্টিকের দলা দেখাল। 'চেষ্টা করেছিলাম। হয়নি। এটাই প্রথম। দোষটা কোনখানে বুঝতে পেরেছি। গোলানোটা ঠিকমত হয়নি। বেশি পাতলা করে ফেলেছিলাম। ঢালার পর শক্ত হওয়ার জন্যেও যথেষ্ট সময় দিইনি। এ জন্যেই এখন আরও ঘন করে ঘুঁটে নিচ্ছি।'

ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। 'চাচী নিশ্চয় বাজারে গে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে। ভাল চাও তো তাড়াতাড়ি স ফেলো এগুলো।'

'ও নিয়ে ভেবো না। সব ঠিক করে ফেলব আমি।'

সরে গেল কিশোর। রান্নাঘরেই থাকল না আর। চাচী এসে ঢোকার সময় ওখানে কোন কিছুর বিনিময়েই থাকতে রাজি নয় সে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে নোটবুকটা বের করল। নতুন কেসটার ব্যাপারে যে সব নোট লিখে রেখেছে, দেখে দেখে সেগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল।

নতুন একটা পাতার ওপরে লিখল সে–সারালিন জুবের, ফেইথ হীলার। আরও কিছু লিখতে যাচ্ছিল, দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকল মুসা।

সারালিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কি দেখে এসেছে, ওকে জানাল কিশোর।

'আমি জানতাম!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মুসা। 'শুরু থেকেই সন্দেহ করেছিলাম মহিলা একটা ঠগ। এখন তো প্রমাণ হয়ে গেল। জুবেরদের সহকারী হিসেবে কাজ করছে ওই ভুয়া বেতো রোগীটা। সারালিনের ব্যাপারেও নতুন খবর শুনে এলাম। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাকি মহিলাদেরকে ফেইথ হীলিঙের তালিম দেয়। মা গিয়েছিল মিসেস জুমিংদের বাড়িতে, সান্ত্বনা দিতে। কয়েক দিন আগে চুরি হয়েছে ও বাড়িতে। মাকে বলেছে মিসেস জুমিং, চুরি হওয়ার কয়েক হপ্তা আগে নাকি সারালিন তাকে তালিম দিতে গিয়েছিল। ফী হিসেবে মোটা টাকা আদায় করে ছেড়েছে। অনেক টাকার ভেষজ ওষুধ বিক্রি করেছে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল মুসা, 'কথাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে–না হওয়ার কোন কারণ নেই, মিসেস জুমিং মিথ্যে বলবে না–তাহলে কি দাঁড়াল?'

'চাচী অবশ্য পত্রিকার লেখা পড়েই আগাম বলে দিয়েছিল,' কিশোর বলল, 'এই ব্যবসা শুরু করবে সারালিন। এখন দেখা যাচ্ছে আরও আগে থেকেই শুরু করেছে। ভাবছি, আর কতজনের কাছ থেকে এ ভাবে ঠকিয়ে টাকা আদায় করেছে সারালিন?'

'ডন!' সিঁড়িতে যেন পিস্তলের গুলির মত টাস্‌স্‌ করে উঠল মেরিচাচীর কণ্ঠ। 'এখানে আয়! এক্ষুণি!'

আঁতকে উঠল কিশোর, 'দেখে ফেলেছে!'

'কি?'

ডনের নৌম বানানোর কথাটা মুসাকে জানাল কিশোর।

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'দরজাটা লাগিয়ে দেব?'

'না, দরকার নেই। চাচী এখানে আসবে না।'

নিচের চিৎকার-চেঁচামেচিকে উপেক্ষা করে জুবেরদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো দু'জনে। এতটাই উত্তেজিত হলো মুসা, সারালিন জুবের একটা ঠগ–প্ল্যাকার্ডে বড করে এ কথা লিখে নিয়ে দোকানটার সামনে গিয়ে টহল

দিতেও রাজি।

ইচ্ছে করল অনেক কিছুই, কিন্তু আপাতত কোন কিছু করার উপায় দেখল না ওরা। করতে হলে হাতেনাতে ধরতে হবে, প্রমাণ জোগাড় করতে হবে, তার আগে কিছু করা যাবে না। নোটবুকটা বন্ধ করল কিশোর।

কিভাবে প্রমাণ জোগাড় করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

'যাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি,' মুসা বলল। 'মিসেস জুমিঙের বাড়ি থেকে শুরু করা যায়।'

'কিন্তু লোকে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে আগ্রহী হবে না। পুলিশকে দিতে দিতেই বিরক্ত হয়ে গেছে।'

'তা হয়তো হয়েছে। কিন্তু মা'র সঙ্গে আমাদের পড়শীদের খুব ভাল সম্পর্ক। মা'কে পটিয়ে-পাটিয়ে পাঠাতে পারি, কিংবা সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারি।'

'তাহলে গিয়ে দেখতে পারো। তুমি ওদিকে চেষ্টা চালাও, আমি খবরের কাগজ ঘাঁটতে থাকি। দেখা যাক কোথায় গিয়ে ঠেকে।'

'বেচারী মিসেস জুমিং। প্রথমে দোহন করল তাঁকে সারালিন, তারপর সাফ করে দিয়ে গেল চোরেরা,' আফসোস করে বলল মুসা।

'তাকে দিয়েই ঠগবাজিটা শুরু করেছে সারালিন, বিশ্বাস হয় না আমার। কাঁচা কাজ হলে বোঝা যেত। তারমানে পাকা, বহু বছর ধরে করছে এই লোক ঠকানোর কাজ। শুধু রকি বীচেই নয়, আরও অনেক জায়গায় করে এসেছে।' উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল, উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। 'সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরানো রোগে ভোগা অসুস্থ মানুষেরা ওর শিকার। ফাঁকি দিয়ে ওদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব টাকা হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়ে। এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। মানুষ সতর্ক হয়ে যাওয়ার আগেই গা ঢাকা দেয়।...মা কি করছে, টম সব জানে। সেজন্যেই মিথ্যে বলেছে, রিয়ারসাইডকে রিভারসাইড। শেষ কোন্‌খান থেকে ঠগবাজি করে এসেছে, আমাদের জানাতে চায়নি। চোরের মন পুলিশ পুলিশ!...রবিনকে সাবধান করে দেয়া দরকার।'

'কালই করতে হবে। দেরি করা যাবে না। যদি বিশ্বাস না করে?'

'সেটাই তো সমস্যা,' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'দেখি কি করা যায়!'

পরদিন শনিবার। স্কুলে ফেসটিভ্যালের ড্রেস রিহারসল হবার কথা। রবিনও থাকবে। ওকে সব বলতে হলে টমের কাছ থেকে সরাতে হবে। জোঁকের মত ওর সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকে ছেলেটা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। খুলে গেল ভেজানো পাল্লা।

মেরিচাচী এসে দাঁড়িয়েছেন। কিশোরের দিকে তাকালেন। প্রচণ্ড রেগে গেছেন, চেহারাই বলছে। 'ডন বলল রান্নাঘরে যা করেছে ও, তুই নাকি দেখেছিস?'

'আমি দেখার আগেই ও যা করার করে ফেলেছে। সাফ করে ফেলতে বলেছিলাম...'

'ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারলি না? রান্নাঘরটার কি অবস্থা করেছে!

এখন আমি কখন কি করি...'

উঠে দাঁড়াল মুসা। কিশোরকে বলল, 'চলো না সাফ করে ফেলি। আমিও সাহায্য করব। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

মুসার কথায় কাজ হলো। নরম হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

রান্নাঘরে নেমে এল মুসা আর কিশোর। এক কোণে মুখ গোমড়া করে দুই হাতে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে ডন। ওদের দেখে চট করে ঘুরে গেল।

হেসে ফেলল কিশোর, 'কি, বলেছিলাম না? তোমার খালা নাকি কিছু বলবে না?'

জবাব দিল না ডন।

টেবিলের দিকে তাকাল কিশোর। তিনটে বিকৃত শরীরের নৌম পড়ে আছে। এই জিনিস স্টলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি তো দূরের কথা, রাখতেও দেবে না।

শার্টের হাত গোটাল মুসা। এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। কোন্‌খান থেকে শুরু করবে ভাবছে।

এগারো

'আরেকটু বাঁদিকে কাত করো,' চিৎকার করে বললেন মিস্টার রডরিগ। 'আরেকটু।...হ্যাঁ হয়েছে। এবার পেরেক ঠোকো।'

হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে একটা পেরেক ঢুকিয়ে দিল কিশোর। কাঠের সঙ্গে আটকে গেল তেরপলটা। ফ্লোটের ডেক থেকে লাফ দিয়ে নেমে এলেন মিস্টার রডরিগ।

'ঠিক আছে,' বললেন তিনি, 'এখন এক মিটার পর পর পেরেক লাগাও। তেরপলটা সমান করে ধরে লাগাবে। ভাঁজ পড়ে যাবে নইলে।'

শনিবার সকাল। ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে সদস্যরা। এখনও অর্ধেক কাজ বাকি।

ফ্লোটের অলঙ্করণ করতে কয়েকজন ছাত্রকে সাহায্য করছেন রাশেদ পাশা। হার্ডবোর্ড দিয়ে গাছ বানিয়ে সেগুলোকে রঙ করা হয়েছে। কাত করে ফেলে রাখা হয়েছে শুকানোর জন্যে। শুকালে তখন তুলে বসানো হবে ফ্লোটে।

কিশোর, মুসা আর আরও কয়েকজন মিলে ফ্লোটের মেঝেতে উজ্জ্বল রঙ করা তেরপল লাগাচ্ছে। মিস্টার রডরিগ আর মিস্টার উইলিয়ামস তদারক করছেন, হুকুম দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে এসে নিজেরাও হাত লাগাচ্ছেন।

খানিক দূরে বাজনা বাজাচ্ছে বাদকদল। যারা নাচতে নাচতে মিছিল করে এগিয়ে যাবে ফ্লোটের সঙ্গে তারা নাচ প্র্যাকটিস করছে। ওদের অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মুসা। হাসি-আনন্দ, হই-হট্টগোলের মধ্যে কাজ

এগিয়ে চলেছে।

ভাঁড় সাজবে কে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। খুদে ঘণ্টা লাগানো ত্রিকোণ টুপিটা অনেকের মাথায় পরিয়ে দেখলেন মিস ওয়ান্ডার। কাউকেই পছন্দ হলো না তাঁর। শেষে মুসার মাথায় বসিয়ে দিলেন।

'খাইছে! আমি পারব না,' অস্বস্তিতে মাথা নাড়াল মুসা। টুংটাং করে উঠল সরু, ছোট্ট শেকলে ঝোলানো ঘণ্টাগুলো। 'এ জিনিস মাথায় নিয়ে হাঁটে কি করে মানুষ!'

'তুমিই পারবে,' হেসে বললেন মিস ওয়ান্ডার। 'সবচেয়ে বেশি মানিয়েছে তোমাকে।' একটা লাঠি ধরিয়ে দিলেন মুসার হাতে। লাঠির মাথায় বাঁধা একগুচ্ছ বেলুন। 'এটা দিয়ে মানুষকে বাড়ি মারা প্র্যাকটিস করো। সত্যি সত্যি জোরে মেরে বোসো না আবার। গায়ে যেন লাঠিটা না লাগে, শুধু বেলুন।...হ্যাঁ, মারো তো আমাকে?'

আলতো করে বাড়ি মারল মুসা।

মিস ওয়ান্ডারের হাসিটা বাড়ল। 'চমৎকার! ভাঁড় হিসেবে তোমার তুলনা নেই।'

*

হাতুড়ি ঠুকে পেরেক বসাচ্ছে কিশোর। দু'জন দু'দিক থেকে টানটান করে ধরে রাখছে তেরপলটা। পিঠে হালকা বাড়ি পড়ল কিসের যেন। ফিরে তাকিয়ে দেখে লাল-সাদা পোশাক, মাথায় ত্রিকোণ টুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন ভাঁড়। হাতের লাঠির মাথায় বেলুন বাঁধা।

'শিখে ফেলেছি, না?' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। 'কেমন লাগছে আমাকে?'

'মিস ওয়ান্ডার ওয়ান্ডারফুল এক কাজ করেছেন,' হেসে বলল কিশোর, 'জন্মই হয়েছে তোমার ভাঁড় হওয়ার জন্যে।' এদিক ওদিক তাকাল। 'রবিনকে দেখেছ?'

'পোশাক পরে রানী সাজার প্র্যাকটিস করছে।'

'টম কোথায়?'

'সারা সকালে একবারও দেখিনি।'

'দাঁড়াও, এটা শেষ করে ফেলি। তারপর গিয়ে কথা বলব রবিনের সঙ্গে।'

পেরেক ঠোকায় মন দিল কিশোর।

লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। কাছাকাছি যে-ই আসছে তাকেই বাড়ি মারছে।

কাজ সেরে ফ্লোট থেকে নেমে এল কিশোর। স্কুল বিল্ডিঙের দিকে রওনা হলো। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার একটা শ্বেত পাথরের মূর্তি বসিয়ে রাখা হয়েছে পাথরে বাঁধানো চত্বরে। তার নিচে এসে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। মূর্তির গায়ে বেলুন দিয়ে বাড়ি মেরে বলল, 'কার দিকে তাকিয়ে আছেন, স্যার?'

'এই, কি করছ?' পেছনে শোনা গেল রাগত কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়াল দু'জনে।

দাঁড়িয়ে আছেন ডেপুটি হেডটীচার মিস্টার বারবেট।

'আমার কোন দোষ নেই, স্যার। যাকে সামনে দেখব তাঁকেই বাড়ি মারতে বলে দিয়েছেন মিস ওয়ান্ডার,' বলেই বেলুন দিয়ে বাড়ি মারল মিস্টার বারবেটের গায়ে।

একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার বারবেট। দ্বিধায় পড়ে গেছেন। মুসা আবার লাঠি তুলতেই দ্রুত কেটে পড়লেন ওখান থেকে।

কৃত্রিম আক্ষেপের সুরে বলল মুসা, 'একেবারেই বেরসিক।'

মুচকি হাসল কিশোর, 'ভাল জিনিসই তুলে দিয়েছেন তোমার হাতে মিস ওয়ান্ডার।...সময় নষ্ট করছ শুধু শুধু। চলো, রবিনের সঙ্গে আলোচনাটা সেরে ফেলি।'

প্র্যাকটিসের জন্যে একটা ক্লাসরুম খালি করে দেয়া হয়েছে। নানা ধরনের পোশাক পরে জটলা করছে ওখানে অনেকে। বাদকদলের কয়েকজন আছে। ফ্লোটের পেছনে পা ঝুলিয়ে বসে বাজনা বাজাবে ওরা। পেছন পেছন নেচে নেচে এগোবে মরিস-ড্যান্সারদের একটা দল। ওদের পেছনে থাকবে আরও কিছু চরিত্র। সবার পেছনে ভাঁড়।

বিচিত্র সব পোশাকধারীকে দেখা গেল ঘরের ভেতর। মাথা ঢাকা মুখোশ পরে কেউ সেজেছে কুমির, শেয়াল, গাধা, বাঘ; বাকিরা মানুষই আছে, তবে পরনে মধ্যযুগীয় পোশাক।

দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে দুই গোয়েন্দা। সামনে এসে দাঁড়াল একটা হরিণ। ওদের দিকে মাথা নুইয়ে শিং নাড়াল। তার আর কাগজ দিয়ে বেশ সুন্দর শিং বানিয়েছে ছেলেটা।

রানীর পোশাক পরে একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রবিন। টেনেটুনে ঝুল ঠিক করে দিচ্ছে নিচে দাঁড়ানো দুটো মেয়ে।

খুব সুন্দর হয়েছে তার পোশাকটা। ঝলমলে রঙ। ফুলের বেড আর রঙিন পাখির মিশ্রণ মনে হচ্ছে রবিনকে।

'খাইছে!'

মুসার কথা কানে যেতে ফিরে তাকাল রবিন। হেসে হাত নাড়ল। ঝিকিয়ে উঠল যেন রামধনুর সাত রঙ।

মুসা কাছে যেতে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

'দারুণ! সাংঘাতিক! বলে বোঝানো যাবে না!'

'মাথায় পরার হেড-ড্রেসটা বানানো হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হয়েছে,' হাত তুলে আরেকটা টেবিল দেখাল রবিন।

রাজকীয় পোশাকের সঙ্গে মানানসই করে তৈরি একটা রাজকীয় মুখোশ পড়ে আছে টেবিলে। ভোরের সূর্য যেন আলোর ছটা বিকিরণ করছে। সোনার তৈরি মনে হলেও সোনা নয়, সোনালি রঙ করা।

টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে গিয়ে মুখোশটা তুলে নিল রবিন। মাথা গলিয়ে মুখের ওপর নামিয়ে দিল। পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল তার মুখ। কেবল

চোখের জায়গায় দুটো গোল গোল ফুটো।

'খুব ভাল হয়েছে,' প্রশংসা করলেন মিসেস জুটার। 'খোলো এখন। পোশাকের হেমটা সেলাই বাকি রয়েছে।'

পোশাক খুলতে রবিনকে সাহায্য করল মুসা আর কিশোর।

'হুফ্!' হাঁপ ছাড়ল রবিন। 'এ সব জিনিস পরে থাকত কি করে সেকালের রানীরা ভেবে পাই না। যা ভারী আর গরম। উৎসবের দিন গরম পড়লে ঘামতে ঘামতে মরব। বাইরে কি এখন খুব রোদ নাকি?'

'এসো না, দেখে যাও,' আমন্ত্রণ জানাল কিশোর।

বারান্দার সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। গাছের রঙ শুকিয়েছে। ধরাধরি করে তুলে ওগুলো ফ্লোটে বসানো হচ্ছে। ছেলেদের সাহায্য করছেন রাশেদ পাশা।

'রবিন, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' কিশোর বলল। 'টমের ব্যাপারে।'

হাসল রবিন। 'ওকে নিয়ে তর্কাতর্কি করে এমন সুন্দর দিনটাকে মাটি করতে চাই না।'

'তর্ক করব না,' মুসা বলল। 'ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো না তুমি। জানা দরকার।'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। 'বেশ, বলে ফেলো।'

দোকানের সামনে যে লোকটাকে জুবেরের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে, তার কথা বলল কিশোর। সারাদিন কিভাবে মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা আদায় করে, সেটাও জানাল।

চুপচাপ শুনল রবিন। 'কিন্তু তাতে টমের দোষটা কোথায়?'

'ওর বাবা-মা কি করছে, নিশ্চয় জানে ও,' মুসা বলল।

'হয়তো জানে। কিন্তু মা যদি খারাপ কাজ করেই থাকে, বাধা দেবে কিভাবে?'

'তা নাহয় দিতে পারল না। কিন্তু তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলেছে ও।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'কোন্খান থেকে এসেছে ওরা।'

'একটা চিঠি দেখেছি,' কিশোর বলল। 'রিয়ারসাইড কাউন্টির ঠিকানায় গিয়েছিল, রিভারসাইড কাউন্টিতে নয়। দুটো জায়গা আলাদা।'

'যে একটা মিথ্যে বলে, সে আরও মিথ্যে বলতে পারে,' মুসা বলল। 'রবিন, ওকে তোমার বিশ্বাস করা উচিত হচ্ছে না। ওর কাছ থেকে সরে থাকা ভাল।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'ওকে তুমি দেখতে পারো না বলে এ রকম করে বলছ। ও মিথ্যে বলেছে, এটা যতক্ষণ প্রমাণ করতে না পারবে, আমি কিছু বিশ্বাস করব না।'

মুসা বা কিশোরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দৌড়ে প্র্যাকটিস রুমে চলে গেল রবিন।

বোকা হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা। রবিনের

আচরণ যে স্বাভাবিক নয়, আরও নিশ্চিত হলো ওরা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'ওকে বলতে এসে ব্যাপারটা বোধহয় আরও খারাপ হয়ে গেল।'

বেলুন-লাঠি দিয়ে মেঝেতে বাড়ি মারতে মারতে মুসা বলল, 'এখন কি করা?'

'টমের অন্তত একটা মিথ্যে রবিনের কাছে ফাঁস করে দিতে হবে। রিভারসাইডে অভিনয়ের সময় কি নাম ব্যবহার করত টমের বাবা, ওর মা'র কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। আমি শিওর, টমের মিথ্যেটা ধরা পড়বেই।'

'দেখো, যা পারো করো,' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল মুসা।

ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'আজ বিকেলেই যাব সারালিন জুবেরের দোকানে।'

আলতো করে বেলুন দিয়ে কিশোরের মাথায় বাড়ি মারল মুসা, 'তোমার মগজটাই এখন একমাত্র ভরসা।'

বাসে করে এসে ম্যানার স্ট্রীটে নামল দুই গোয়েন্দা। শনিবারের রোদে উজ্জ্বল বিকেল। গির্জার আশেপাশে লোকের ভিড়। বেড়াতে এসেছে।

সারালিনের দোকানেও ভিড়। বিক্রিটিক্রি ভালই হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সারালিন, তাকেই দেখা গেল না। কাউন্টারের ওপাশে রয়েছে টম।

'গেল সব!' দোকানের একটা র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা। 'এসে কোন লাভ হলো না। কি করব?'

'ডনের জন্যে কয়েকটা জিনিস কিনব,' জবাব দিল কিশোর। 'সন্দেহ করতে পারবে না টম।'

জিনিস পছন্দ করতে করতে আবার বলল, 'একটা কথা মাথায় এসেছে। জিজ্ঞেস করব ওকে। দেখি, কি বলে ফাঁকি দেয় এবার।'

কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

'হালো,' টম বলল। 'স্কুলে তোমাদের সাহায্য করতে যেতে পারলাম না আজ, সরি। এখানে এত বেশি ব্যস্ত...তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে?'

'মোটামুটি,' কাছাকাছি কাউকে দেখতে পেল না কিশোর। 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

হাসল টম। 'করে ফেলো।'

'সেদিন তোমার আম্মার মীটিঙে গিয়েছিলাম। একজন বেতো রোগীকে সারিয়ে দিয়েছেন। কাল রাতে তোমার আব্বার সঙ্গে এই দোকানের সামনে তাকে দেখেছি।'

'তাই? তাতে কি হয়েছে?'

'সেদিন মনে হয়েছিল লোকটা তোমার আম্মার একেবারে অপরিচিত। তাহলে মাত্র দু'দিন পর তোমার আব্বার সঙ্গে অতি পরিচিতের মত কথা বলে কিভাবে?'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল টমের মুখে। 'তারমানে, বলতে চাইছ ঘটনাটা সাজানো নাটক ছিল?'

'হ্যাঁ,' কিশোরের আগেই জবাব দিয়ে দিল মুসা। 'তাই ছিল না?'

'না,' মসৃণ স্বরে বলল টম। 'রোগে ভুগে ভুগে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে লোকটা। অসুখ থাকায় কাজও করতে পারত না ঠিকমত। সারার পর শরীর ঠিক হলে প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় এল, সেটা কাজের। সবাই চলে গেলে আম্মাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে হলে রয়ে গেল সে। ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা কাজও চেয়ে বসল আম্মার কাছে।' হাসল টম। 'কি আর করবে আম্মা। দোকানের ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলল। সেজন্যেই এসেছিল। দাঁড়াও, ডাকি, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

দোকানের পেছনে চলে গেল টম।

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর মুসা। অস্বস্তি বোধ করছে।

কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল টম। সঙ্গে সেই সরু-মুখো লোকটা।

'কন,' পরিচয় করিয়ে দিল টম, 'এরা আমার বন্ধু—কিশোর, আর ও মুসা।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' নীরস স্বরে বলল লোকটা। 'আমার নাম কন ডিকি।'

'ব্যথাট্যতা কি এখনও আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'না একেবারে শেষ?'

'কিচ্ছু নেই। দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শান্তিতে আছি। মিসেস জুবেরের ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।' টমের দিকে তাকাল কন। 'তোমার আম্মার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।'

দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল টম। চোখে নীরব জিজ্ঞাসা—আর কোন প্রশ্ন আছে?

'ভাল আছেন শুনে খুশি হলাম।' টমের দিকে তাকাল কিশোর। তাক থেকে তুলে আনা দুটো জিনিস দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কত?'

দাম মিটিয়ে মুসাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

'টমের কথা বিশ্বাস করেছ তুমি?' ক্ষোভের সঙ্গে জানতে চাইল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'করতাম, যদি খামের ওপর ওই নামটা না দেখতাম।'

'কোন নাম?'

দোকানের দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাল কিশোর। ধারে কাছে শোনার মত কেউ আছে কিনা দেখল। 'ভুলে গেছ? রিয়ারসাইড কাউন্টি থেকে আসা ওই চিঠিটা। ঠিকানায় নাম লেখা ছিল কে· ডিকি। কে· মানে কন। রোগ সারার সঙ্গে সঙ্গে সারালিন লোকটাকে চাকরি দিয়েছে এ কথা যদিও বা বিশ্বাস করা যায়, মীটিঙের পরদিনই দোকানের ঠিকানায় তার নামে চিঠি চলে এসেছে, এটা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'ঠগবাজিটা আগেই সন্দেহ করেছিলাম,

এখন শিওর হলাম। ভাবতে হবে, কিভাবে সেটা প্রমাণ করা যায়।'

বারো

'ওঠ, ওঠ, মুসা, জলদি ওঠ! সব নিয়ে গেছে আমাদের!'

বিছানায় গড়িয়ে চিত হলো মুসা। বিড়বিড় করে ঘুমের ঘোরেই কি বলল। কাঁধ চেপে ধরা হাতটা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

বিচিত্র মোড় নিয়েছে স্বপ্নটা।

অলিম্পিক ঘোড়দৌড়ের ট্রায়াল চলছে। পাখা মেলে যেন উড়ে চলেছে ওর ফায়ার। সব ঘোড়াকে ছাড়িয়ে লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল, এই সময় ভাঙিয়ে দেয়া হলো স্বপ্ন। শেষটা আর দেখা হলো না।

'মা! সরো!'

'মুসা, ওঠ না! চুরি করে নিয়ে গেছে তো সব!'

বিছানায় উঠে বসল মুসা। গায়ে আলুথালুভাবে চাদর জড়ানো। চোখ মিটমিট করে তাকাল মায়ের দিকে। 'কি?'

শোবার পোশাক পরেই চলে এসেছেন মা। 'এইমাত্র নিচে থেকে এলাম। রাতে চুরি হয়েছে আমাদের বাড়িতে।'

'যাহ্...'

'পুলিশকে ফোন করব। কাপড় পরে নে তাড়াতাড়ি।'

পুরানো জিনস আর সবুজ ঢোলা শার্টটা পরে নিল মুসা।

ওর বিছানায় বসে পড়েছেন মা। 'রিসিভারটা কোথায়?'

দু'জনেই তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। যেখানে জিনিসপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে এলোমেলো করে রেখেছে মুসা। একটা মহাজগাখিচুড়ি। 'এক্সটেনশন লাইন রেখে তোর লাভটা কি এখানে যদি কাজের সময় খুঁজেই পাওয়া না যায়?'

'শান্ত হও, দিচ্ছি বের করে।'

বহু খোঁজাখুঁজির পর তারটা দেখতে পেল মুসা। সেটা ধরে ধরে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করল রিসিভারটা। মায়ের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'কোন্ জিনিসটা কোন্খানে আছে, আমার মুখস্থ। বলার সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেব।'

'হ্যাঁ, নমুনা তো দেখলামই। আধঘণ্টা লাগালি রিসিভার বের করতে।'

প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্যে মুসা বলল, 'জিনিস কি বেশি নিয়েছে?'

'গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আয় না।'

পা টিপে টিপে নামতে শুরু করল মুসা। যেন আশঙ্কা আশেপাশেই লুকিয়ে আছে চোর। ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

সামনের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। কোট আর ব্যাগগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। কেবিনেট থেকে ড্রয়ারগুলো খুলে ফেলে রাখা হয়েছে। ভেতরের জিনিসপত্র সব ঢেলে দিয়েছে কার্পেটের ওপর।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল মুসা।

পেছনের লম্বা ঘরটায় এসে ঢুকল। একটা খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ফুরফুর করে ঢুকছে ভোরের হাওয়া।

'ছুঁসনে কিছু।'

ফিরে তাকাল মুসা। মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। 'পুলিশ বলেছে কোন কিছুতে হাত না দিতে।'

'দেব না,' মুসা বলল। 'কোন শব্দই তো শুনলাম না। নিচতলায় ঢুকে সারা বাড়ি তছনছ করে দিয়ে গেল ওরা, একটা শব্দ কানে ঢুকল না। ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি!'

'সাবধান থেকেছে, যাতে শব্দ না হয়। যা করার নিচতলায়ই করেছে। ভাগ্যিস ওপরতলায় যায়নি! তাহলে ফকির বানিয়ে রেখে যেতে পারত,' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মা। কপাল টিপে ধরলেন।

'মাথা ধরেছে? অ্যাসপিরিন এনে দেব?'

মাথা নেড়ে মা বললেন, 'কতবার তোর বাবাকে বললাম একটা অ্যালার্ম সিসটেম লাগিয়ে দিতে, দিল না...'

'অ্যালার্ম দিয়ে কি হবে? ঘণ্টা শুনলেই চোরেরা পালাত। আসলে দরকার ছিল একটা বাঘা কুত্তার। কি কি চুরি গেছে, দেখেছ?'

'সময় পাইনি। ঘরের অবস্থা দেখেই দৌড়ে গিয়ে তোকে ডাক দিলাম। বোস এখানে। আমি কাপড় বদলে আসি। পুলিশ এলে দরজা খুলে দিস।'

ওপরতলায় চলে গেলেন মা।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল মুসা। কিছু একটা করা দরকার। এ রকম হাত গুটিয়ে রেখে পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করার কোন মানে নেই।

হলে এসে ঢুকল মুসা। ওপর দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে বলল, 'মা, আমি কিশোরকে ফোন করছি।'

জবাব এল না।

কিছু না বলে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল সে।

*

'পুলিশ কি বলল?' জানতে চাইল কিশোর।

মুসাদের রান্নাঘরে বসে টোস্ট আর কমলার রস খাচ্ছে। মিসেস আমান পাশের ঘরে। ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি আর ইনশিওরেন্স ফার্মকে ফোন করছেন।

'বলল,' জবাব দিল মুসা, 'কাঁচা হাতের কাজ। পেছনের একটা জানালা দিয়ে ঢুকেছে, দরজা দিয়ে বেরিয়েছে। বাড়ি মেরে কাঁচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানি খুলেছে। খুব সহজ, সাধারণ চুরি। পনেরো মিনিটের বেশি ঘরে ছিল না চোর। ভারী জিনিসগুলো ধরেনি। দামী অ্যানটিকগুলো নিতে পারেনি বোধহয় ভারী বলেই। ছোটখাট দামী কিছু জিনিস নিয়েছে। মা'র হাতব্যাগটাও নিয়ে গেছে। টাকা কমই ছিল ওতে। ক্রেডিট কার্ড আর মূল্যবান কাগজপত্র ছিল।'

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছে পুলিশ?'

'না। রবিবারে নাকি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা কাজ করে না। কাল সকালেই চলে আসবে। ততক্ষণ যা যেভাবে আছে, সেভাবেই রাখতে বলে গেছে।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। 'গুড। আমাদের সূত্র খুঁজতে সুবিধে হবে।'

'কিন্তু কিছু ছুঁতে তো মানা করে গিয়েছে পুলিশ।'

'ছোঁব না। চোখ দিয়ে খুঁজব। আচ্ছা, আশেপাশে যারা চুরি করেছে, তারাই কি তোমাদের ঘরে ঢুকেছে বলে পুলিশের ধারণা? আমার ধারণা তা-ই।'

'আমারও। পুলিশ এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। শুধু বলেছে, যা যা চুরি গেছে একটা লিস্ট করে রেখে দিতে। সেটা আমাকে দিয়ে হবে না। মা আর বাবা কবে কোন্ জিনিস কিনে এনে কোথায় রাখে, আমি খেয়ালই করি না।' কমলার রসের গ্লাসে চুমুক দিল মুসা। 'তাহলে খুঁজবেই?'

পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল কিশোর। 'সন্দেহজনক কিছু দেখলে লিখে রাখতে হবে।'

পেছনের জানালাওয়ালা লম্বা ঘরটা থেকে খোঁজা শুরু করল ওরা। বাঁ দিকের পাল্লাটার ওপরের দিকে খানিকটা জায়গার কাঁচ ভাঙা। কার্পেটে কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে। উবু হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল কিশোর।

'রবিনকে ছাড়াই এ কেসের তদন্ত করছি আমরা,' মুসা বলল, 'ভাবতে কেমন লাগছে না?'

নিচের দিকে তাকিয়ে থেকেই নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ফোন করব ওকে?'

সোজা হলো কিশোর। 'করা যায়।'

ফোন করতে গেল মুসা। ফিরে এল আধ মিনিটের মধ্যে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানাল, 'বাড়ি নেই। আন্টির সঙ্গে কথা বলেছি।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'কার সঙ্গে বেরিয়েছে আন্দাজ করতে পারো?'

'টম।'

'হ্যাঁ।'

'চলো, বাইরেটা দেখি। পরে সব বলা যাবে রবিনকে।'

'যদি শুনতে চায়।'

কোন সূত্র পাওয়া গেল না।

বাকি সকালটা মুসার আম্মাকে চুরি যাওয়া জিনিসের লিস্ট করতে সাহায্য করল দু'জনে। এর মধ্যেও এমন কিছু পেল না, যেটার সূত্র ধরে 'কে চোর' তার হদিস করা যায়।

*

পরদিন সকালে স্কুলে রবিনের সঙ্গে দেখা হলো দু'জনের।

'সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছে তো চোরেরা!' রবিন বলল। 'কাল রাতে বাড়ি ফিরলে মা আমাকে সব বলেছে। রাতেই ফোন করতে চেয়েছিলাম। মা

বলল, অত রাতে করে আর কাজ নেই। মুসা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মুসা, বেশি জিনিস নিয়েছে?'

আগের দিন যা যা ঘটেছে, সব রবিনকে জানাল মুসা আর কিশোর।

রবিনের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে হঠাৎ ফিরে তাকাল কিশোর। টম দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে।

টম জিজ্ঞেস করল, 'কিসের কথা বলছ তোমরা?'

'টম,' রবিন বলল, 'কাল মুসাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে।'

তাকিয়ে রইল টম। 'তাই নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ। শনিবার রাতে।'

'শনিবার!' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে টম বলল, 'আশ্চর্য!'

'এতে আশ্চর্যের কি হলো? শনিবার রাতে কি চুরি করে না নাকি চোরেরা?' মুসার প্রশ্ন। 'অফ ডিউটি থাকে?'

'না, তা বলছি না...কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতেও চুরি? গোয়েন্দার বাড়িতে। এ জন্যেই অবাক হচ্ছি।'

'এ নিয়ে পাঁচটা চুরি হলো আমাদের পাড়ায়।'

'ঢুকল কি করে? জানালা ভেঙে নাকি?'

'হ্যাঁ। এ ছাড়া ঢোকার আর পথ কই? সদর দরজা তো আর চোরের জন্যে রাতে খুলে রাখে না মানুষ।'

ভ্রূকুটি করল টম, 'না, তা রাখে না।...যাই, কাজ আছে আমার। দেখা হবে।'

'কাল না বললে আজ আমাকে বল ছোঁড়া প্র্যাকটিস করাবে,' রবিন বলল।

'বলেছি। কিন্তু একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে। পরে শেখাব।' হাসল টম। 'টিফিনে দেখা হবে।'

টম চলে গেলে দুই বন্ধুর দিকে ফিরল রবিন। 'ও বলেছে একসঙ্গে অনেকগুলো বল ছোঁড়ার কৌশল শেখাবে আমাকে। ফ্রোটে দেখানোর জন্যে।' সামান্য দ্বিধা করে বলল, 'আমি জানি, ওকে তোমরা পছন্দ করো না। কিন্তু আমি মিশে দেখেছি, অত খারাপ নয় ও।'

কিশোর বা মুসা জবাব দেয়ার আগেই ঘণ্টা পড়ল। যে যেখানে ছিল, দ্রুত ক্লাসের দিকে রওনা হলো ছাত্ররা। তিন গোয়েন্দাও পা বাড়াল।

তেরো

পরদিন আরেকটা চুরির খবর পাওয়া গেল।

ওদেরই স্কুলের একটা ছেলে, জনি বিয়াভাদের বাড়িতে। টিফিনের সময় ওর সঙ্গে কথা বলল তিন গোয়েন্দা।

ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে যেন মুখিয়েই ছিল জনি। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো, কিভাবে ঢুকেছে,

কিছুই বোঝা যায়নি। রাতে শব্দ শুনে আব্বা নিচে নেমে দেখতে যায়। নিশ্চয় তাকে নামতে শুনেছিল চোর। সামনের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিছু নিতে পারেনি।'

'জানালা-টানালা খোলা ছিল? কাঁচ ভাঙা?' জানতে চাইল কিশোর।

'নাহ্। পুলিশের ধারণা, আমার দাদু সামনের দরজাটা খুলে রেখেছিল। রাতে হেঁটে এসে লাগাতে ভুলে গিয়েছিল। এই ভুলে যাওয়াটা দাদুর একটা রোগ। ডাক্তার দেখিয়ে সারাতে না পেরে যোগাযোগ করেছিল এক ফেইথ হীলার মহিলার সঙ্গে…'

'সারালিন জুবের?'

'হবে হয়তো। আমি জানি না। আরও একটা রোগ আছে দাদুর। বাত। ফেইথ হীলার মহিলা নাকি বাতও সারাতে পারে। দাদু তাকে বাড়ি আসতে অনুরোধ করেছিল।'

'মহিলা এসেছিল?'

'হ্যাঁ…'

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। আর কোন কথা হলো না।

বিকেলে ছুটির পর বল-প্র্যাকটিসের কথা বলে তাড়াহুড়া করে চলে গেল রবিন। গেট দিয়ে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল মুসা আর কিশোর।

আনমনে বলল কিশোর, 'ভুল করে দরজা খুলে রাখার ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। বড় বেশি কাকতালীয়।'

'জনিদের বাড়ির কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'দরজা খোলা না পেলে ঢুকল কি করে?'

'চাবি দিয়ে দরজা খুলে নিয়েছে।'

'চাবি পেল কোথায়?'

'সেটাই বুঝতে পারছি না। তবে একটা জিনিস বুঝে গেছি, দরজা দিয়েই ঢোকে চোর। তোমাদের পাড়ায় যতগুলো চুরি হয়েছে, একটা জিনিস কমন–জানালার কাঁচ ভাঙা পাওয়া যায়। কেবল জনিদের বাড়িতে পাওয়া যায়নি। এর মানে কি? জনির বাবা শব্দ শুনে দেখতে যাওয়ায় কিছু না নিয়ে পালাতে বাধ্য হয় চোর। সময় পায়নি। সময় পেলে চুরি করে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটা জানালার কাঁচ ভেঙে দিয়ে যেত। এটা করে রেখে যায় পুলিশের নজর অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে। যাতে পুলিশ ভাবে, চোর জানালা দিয়ে ঢুকেছিল। নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে।'

'সেই কারণটা কি?'

'জানি না। জানলে, আমার বিশ্বাস, অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব।'

'কিন্তু দরজা দিয়ে যে ঢোকে বলছ, খোলে কিভাবে তালা? আমাদের দরজায় ডাবল লক লাগানো। বাইরে থেকে চাবি ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়েই খোলা সম্ভব নয়। আমাদের চাবিটা খোয়া যায়নি। চুরির পরেও দেখেছি। আছে।'

প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না কিশোর।

পরদিন সকালের কাগজে আরেকটা চুরির খবর বেরোল। রাতে উইলো ডেল নামে এক মহিলার বাড়িতে চুরি হয়েছে। মুসাদের পাড়াতেই বাড়ি।

তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে রইল কিশোর। স্কুল ছুটির পর বেরোতে যাবে, ডেকে পাঠালেন মিস ওয়ান্ডার। ক্যামকর্ডারটা নিয়ে খানিকক্ষণ প্র্যাকটিস করতে বললেন কিশোরকে। কোন গোলমাল থাকলে আগেই সেরে নিতে বললেন, যাতে উৎসবের দিন কোন ঝামেলা না বাধায় যন্ত্রটা।

রবিন চলে গেল। মুসা অপেক্ষা করতে লাগল কিশোরের জন্যে। প্র্যাকটিস শেষ করে ক্যামকর্ডারটা স্কুলের স্টোরে রেখে বেরিয়ে এল কিশোর। দু'জনে মিলে রওনা হলো মিস উইলো ডেলের বাড়িতে।

মহিলা মাঝবয়েসী। কথা বলে জানা গেল, সে-ও বাতের রোগী। সারালিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে বাড়িতে ডেকে এনেছিল রোগ সারানোর জন্যে। একটা মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল মিস ডেলের কাছে। তাকে চিকিৎসা করার সময় নাকি নিজের হাতে একটা চাবি চেপে ধরে রেখেছিল সারালিন।

'চাবি কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'রোগীর ব্যবহার করা জিনিস ধরে মন্ত্র পড়লে নাকি রোগীর ভেতরে বিশ্বাসটা তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে, জোরাল হয়।'

'তারপর?'

'একটা জিনিস যখন চাইল, হাতের কাছে কলম দেখে সেটা দিতে চেয়েছিলাম। সারালিন বলল, ধাতব জিনিস হলে ভাল হয়। নিজে থেকেই বলল চাবিটার কথা।'

'সদর দরজার চাবি নাকি?'

'তুমি কি করে জানলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল মিস ডেল।

উত্তেজনায় বুক কাঁপছে কিশোরের। 'অনুমান।'

মাথা ঝাঁকালেন মিস ডেল। 'হ্যাঁ, সদর দরজার চাবি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? আমার ভেতরে বিশ্বাস ঢুকিয়ে চাবিটা ফেরত দিয়ে চলে গেল সারালিন।'

'সত্যি বিশ্বাস ঢুকেছে আপনার মধ্যে? ব্যথা কমেছে?'

'বিশ্বাস ঢুকেছে কিনা জানি না। কিন্তু কই, ব্যথা তো যাচ্ছে না। সাময়িক একটু আরাম হয়েছিল অবশ্য। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে যখন বিড়বিড় করে কথা বলছিল, মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল আমার–কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। ও চলে যেতেই সব স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার। ব্যথা সেই আগের মত। কয়েকবার চিকিৎসা নিলে হয়তো পুরোপুরি সারবে!'

বাড়ি ফিরে ডনকে দেখতে পেল না কিশোর। কোথাও তার সাড়াশব্দও পেল না। ডিনারের সময়ও যখন টেবিলে এল না, অবাক লাগল। চাচীকে জিজ্ঞেস করল, 'ডন কই?'

'ওর ঘরে। স্কুল থেকে ফিরে সেই যে ঢুকেছে, আর বেরোয়নি। কি করছে খোদাই জানে। ডাকতে গিয়েছিলাম, বলল পরে খাবে।'

কৌতূহল হলো কিশোরের। উঠে দাঁড়াল।

'তুই আবার যাচ্ছিস কোথায়?'

'ডন কি করছে দেখে আসি।'

ওপরে উঠে দরজায় টোকা দিল কিশোর।

ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

'আমি।'

'দরজা খোলা।'

পাল্লা ঠেলে খুলে ভেতরে পা রাখল কিশোর।

গভীর মনোযোগে প্লাস্টার অভ প্যারিস দিয়ে নৌম বানাচ্ছে ডন। সেদিন মেরিচাচীর বকা খাবার পর আর তাঁর কোন জিনিস ছোঁয়নি। ইয়ার্ড থেকে খুঁজে খুঁজে পুরানো পাত্র আর হাতা বের করেছে। সেগুলো দিয়ে কাজ করছে নিজের ঘরের মেঝেতে বসে।

ক্রমাগত প্র্যাকটিস করতে করতে নৌম বানানোয় সফলতা এসেছে ডনের। সদ্য বানানো প্লাস্টিকের দুটো নিখুঁত নৌম বসে আছে ওর পাশে, মেঝেতে।

'কেমন হলো?' নৌম দুটো দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ডন।

'ভাল। খুব ভাল।'

'আরও সুন্দর হবে, রঙ দিয়ে যখন চোখ, ভুরু এঁকে দেব।'

'হুঁ।' চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল কিশোরের কৌতূহলী চোখ। অদ্ভুত দেখতে প্লাস্টিকের একটা বাতিল জিনিস দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এটা কি?'

'আমার হাতের ছাপ। নৌম বানাতে গিয়ে গবেষণা কম করিনি। দেখেছি, অর্ধেক শুকিয়ে আসা প্লাস্টিকে যদি হাত চেপে ধরা হয়, তাতে স্পষ্ট ফুটে ওঠে হাতের ছাপ। শক্ত হয়ে গেলেও তাতে ছাপটা থেকে যায়। যতদিন ইচ্ছে রেখে দিতে পারো। বড় হয়ে নিজের হাতের ছাপ দেখে নিজেই অবাক হতে পারবে, ছোটবেলার কথা মনে করে মনে মনে হাসতে পারবে—এত ছোট ছিল আমার হাত!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছাপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ডন, তুমি একটা জিনিয়াস! বুঝে গেছি, কিভাবে কাজটা করে ওরা!' ডনের সাদা পাউডার মাখা নোংরা হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে বলল, 'থ্যাংক ইউ! অনেক ধন্যবাদ তোমাকে!'

দরজার দিকে ছুটল কিশোর। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল ডন, 'বেশি খাটাতে খাটাতে মাথাটা পুরোপুরিই গেছে ওর!'

ডিনারের পর মুসাকে ফোন করল কিশোর।

'কে, মুসা? এক্ষুণি চলে এসো।'

'এখন? কি ব্যাপার?'

'এসো। এলেই জানতে পারবে।'

তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে এসে বসল কিশোর। আধঘণ্টা পর মুসার সাইকেলের বেল কানে এল।

সাইকেলটা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল মুসা। 'কি হয়েছে? এত জরুরী তলব?'

'কি করে চাবি জোগাড় করে ওরা, জেনে গেছি,' কোন ভূমিকা না করে বলল কিশোর।

'খাইছে! বলো কি?'

'হ্যাঁ। বসো। দেখাচ্ছি।' হাত বাড়াল কিশোর। 'দাও তো তোমার সাইকেলের চাবিটা।'

আস্তে বাড়িয়ে দিল মুসা।

চাবিটা নিতে নিতে কিশোর বলল, 'তোমার চোখে কি পড়েছে?'

চোখ মিটমিট করল মুসা। হাত দিয়ে ডলল। 'কই, কিছু না তো!'

'চোখ কচকচ করছে না?'

'না!' আবার চোখ ডলল মুসা।

'ও, তাইলে আমি ভুল দেখেছি।'

কিশোরের এ ধরনের কথায় অবাক হলো মুসা।

চাবিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর।

'কি করছ তুমি? চাবিটা নিলে, আবার ফেরত দিলে!'

'কাজ হয়ে গেছে।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'প্লীজ, কিশোর, তোমার মঙ্গল গ্রহের ভাষাটা বাদ দাও। সহজ করে বলো, কি বলতে চাও।'

ডান হাতটা চিত করল কিশোর। প্লাস্টার অভ প্যারিসের একটা নরম দলা আটকে রয়েছে তালুতে। তাতে স্পষ্ট বসে গেছে মুসার চাবিটার দাগ।

হেসে মাথা দোলাল কিশোর, 'এবার বুঝলে তো?'

একবার কিশোরের হাতের দিকে একবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। 'না, বুঝিনি!'

'এটা প্লাস্টার অভ প্যারিস। হাতের তালুতে আটকে রেখেছিলাম। তোমার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে চোখে কিছু পড়েছে বলে তোমাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিলাম, মন আর চোখ অন্য দিকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে আমার হাতের দিকে না তাকাও। এই সুযোগে চাপ দিয়ে চাবিটার ছাপ ফেলে দিয়েছি প্লাস্টার অভ প্যারিসে। এই ছাপের মাপ নিয়ে সহজেই যত খুশি ডুপ্লিকেট চাবি

বানিয়ে ফেলা যায়। তোমার সাইকেলটা চুরি করা কি আর তখন কঠিন হবে?'

বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দিল মুসা, 'মোটেও না। তারমানে সারালিন...'

'হ্যাঁ। রোগীর চাবি হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়া কিংবা অন্যকিছু পড়ার ছুতোয় তাকে অন্যমনস্ক করিয়ে রাখে সারালিন। চাবির ছাপ নিয়ে যায়। রাতে তার দলের লোকদের পাঠায় চুরি করার জন্যে।'

'উফ্, জঘন্য মহিলা! কতভাবে যে সর্বনাশ করছে লোকের! ওকে এক্ষুণি ধরা দরকার। পুলিশকে ফোন করছ না কেন?'

'হাতেনাতে ধরতে চাই চোরগুলোকে। একটা ফাঁদ পাততে হবে।'

'কি করে?'

'সারালিনের ওপর নজর রাখতে হবে। দেখব, এরপর কার বাড়িতে রোগ সারাতে যায় সে। ও বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রতি রাতে ওই বাড়ির ওপর চোখ রাখব, লুকিয়ে থেকে, যতক্ষণ না চোর আসে। দরকার হয় পুলিশকে জানিয়েই যাব পাহারা দেয়ার জন্যে।'

'হুঁ! কিন্তু আজ তো আর হবে না। কালও না। কাল উৎসব।'

'ফ্লোটের পর থেকে পুরোদমে পেছনে লাগব সারালিনের। এখন তো শিওর হয়ে গেছি, চোরের দলের লোক সে। কিভাবে চাবি বানায়, তাও জেনে গেছি। ওদের ধরা আর কঠিন হবে না। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।'

চোদ্দ

ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল কিশোরের, আজ উৎসবের দিন। বিছানা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে।

চমৎকার দিন। ফেসটিভ্যালের জন্যে উপযুক্ত। ঝলমলে রোদ। পরিষ্কার নীল আকাশ। ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে বাতাস। ভোরের কনকনে ঠাণ্ডাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে আরম্ভ করেছে।

তাড়াতাড়ি গোসল সেরে, কাপড় পরে নিচে নামল। নাস্তা সেরে ফোন করল মুসাকে। মুসা জানাল, স্কুলে রওনা হচ্ছে। ওখানে দেখা হবে।

রবিনকে ফোন করল কিশোর। বার বার চেষ্টা করেও লাইন পেল না। বোধহয় টেলিফোন নষ্ট। থাক, স্কুলে গেলেই দেখা হবে। বেরিয়ে পড়ল সে।

স্কুলে পৌছে দেখল, কার পার্ক বোঝাই হয়ে গেছে গাড়িতে। অনেকেই তাদের উৎসবের পোশাক পরে ফেলেছে। গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে রামধনু রঙের স্কুল ফ্লোটটা। চকচকে রঙিন কাগজে রোদ চমকাচ্ছে। অপূর্ব লাগছে দেখতে। ওটার পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত মিউজিক প্র্যাকটিস করছে বাদকেরা।

গেটেই মুসার সঙ্গে দেখা হলো কিশোরের। ওর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে

আছে মুসা।

ওদের দেখে এগিয়ে এলেন মিস ওয়াল্ডার। 'এসেছ। রবিন কোথায়?'

'আসেনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'না। এত দেরি করছে!...আমি জানতাম, শেষ মুহূর্তে একটা ভজঘট পাকাবে! এইই হয়। রানী না পেলে এখন ফ্লোট ছাড়ি কি করে?'

'ভাববেন না, ম্যাডাম। চলে আসবে। রবিন অত কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়।'

কিশোরের কথায় উদ্বেগ কমল না তাঁর। তবে আর কিছু বললেন না।

মিস্টার উইলিয়ামসের গাড়ির পেছনে বাক্স তুলছে ডন। চ্যারিটি স্টলে বিক্রির জিনিস।

ওকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'রবিনকে দেখেছ?'

মাথা নাড়ল ডন।

'টমকে?'

আবার মাথা নাড়ল ডন।

'ডন,' ডাক দিলেন মিস্টার উইলিয়ামস, 'কাজটা শেষ করবে, নাকি শুধু কথাই বলবে!'

'এই যে, হয়ে গেছে, স্যার,' জবাব দিল ডন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, 'দিলে তো একটা বকা শুনিয়ে। আমি কোন কথাই বললাম না, অথচ স্যার বলছেন...'

'সরি,' বলে মুসার কাছে সরে এল কিশোর। 'ডনও দেখেনি ওকে।'

'আসেনি, তাই দেখেনি,' মুসা বলল। 'কিন্তু এতক্ষণ কি করছে ও?'

সময় যাচ্ছে। ফ্লোট ছাড়ার সময় হয়ে গেল। রবিনের দেখা নেই।

স্কুলে ঢুকল দু'জনে। ভাঁড়ের পোশাক পরে নিল মুসা। স্টোর থেকে ক্যামকর্ডারটা বের করে আনল কিশোর। ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে নামতেই দেখা হয়ে গেল মিস ওয়াল্ডারের সঙ্গে। রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

'কোথায় গেছে কিছু বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সকালে বেরোনোর আগে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। ধরেনি। নিশ্চয় ফোন নষ্ট। রবিনেরও নিশ্চয় কিছু হয়েছে। অসুখ-টসুখ।'

'হুঁ। গাড়িতে ওঠো। বাড়ি থেকে নিয়ে আসব।' ঘড়ি দেখলেন মিস ওয়াল্ডার। 'এতক্ষণে সব রেডি করে ফেলার কথা ছিল। কি যে ঘটবে বুঝতে পারছি না!'

রবিনদের রকি বীচের বাড়িতে পৌছতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। গেটের ভেতর ঢুকে দৌড়ে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল কিশোর আর মুসা। বেল বাজাল কিশোর। খুলে দিলেন রবিনের আম্মা।

'রবিনকে নিতে এলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'যেতে দেরি করছে কেন?'

অবাক চোখে ওদের দিকে তাকালেন মিসেস মিলফোর্ড। 'ও তো চলে

গেছে। দশ মিনিট আগে তুলে নিয়ে গেছে ওকে।'

'নিয়ে গেছে?' কিশোরও অবাক।

'হ্যাঁ। ওই যে ছেলেটা, কি যেন নাম…টম। ওর বাবার সঙ্গে এসেছিল। স্কুলে পৌঁছায়নি এখনও রবিন?'

'আমরা দেখলাম না বলেই তো নিতে এসেছি।'

'নিশ্চয় ট্র্যাফিক জ্যাম। আজকাল ঘর থেকে বেরোনোই দায় হয়ে পড়েছে।'

বাইরে গাড়িতে বসে আছেন মিস ওয়ান্ডার। তাঁর কাছে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা।

'আমার ভাল মনে হচ্ছে না,' গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল কিশোর। 'স্কুলে গিয়ে যদি রবিনকে না দেখি, পুলিশকে ফোন করতেই হবে।'

স্কুলে ফিরে দেখল, ফ্লোট চলে গেছে। ড্রাইভওয়েতে কয়েকটা ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও।

'এই, রবিন এসেছিল?' ওদের জিজ্ঞেস করলেন মিস ওয়ান্ডার।

একটা মেয়ে এগিয়ে এল। 'ফ্লোটে উঠতে দেখলাম তো ওকে। পোশাক পরেই উঠেছে।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মিস ওয়ান্ডার। আস্তে করে কপালটা নামিয়ে দিলেন স্টীয়ারিঙে। 'ওহ্, খোদা, বাঁচালে!' কিশোর আর মুসার দিকে ফিরে বললেন, 'চলো। ওদের কাছে। ধরে ফেলা যাবে, অসুবিধে হবে না।'

মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন আবার, 'ভাঁড়ের পোশাকটা খুব ভাল হয়েছে তোমার। দেখি, মুখটা বাড়াও তো, রঙটা একটু মেরামত করে দিই।'

হ্যান্ডব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে মুসার গালে দু'তিনটে পোঁচ মারলেন তিনি। দেখতে দেখতে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার হয়েছে। চমৎকার।' লিপস্টিকটা মুসার হাতে দিয়ে বললেন, 'রেখে দাও। লাল রঙটাই আসল। উঠে গেলেই লাগাবে।'

গাড়ি চালালেন তিনি। রাস্তার দুই ধারে তিনকোনা নিশানের সারি। শহরের মাঝখানটাও ঘিরে ফেলে আলাদা করে দিয়েছে পুলিশ, যাতে গাড়ি ঢুকতে না পারে।

সবখানে মানুষ আর মানুষ। যে দিকেই তাকানো যায়, লোকের ভিড়। এত লোককে রাস্তায় সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণ সময়ে রাস্তাগুলো দেখলে মনেই হয় না ছোট্ট শহরটাতে এত লোকের বাস।

গাড়ি পার্ক করার জন্যে পেছন দিকের একটা খালি রাস্তা খুঁজতে লাগলেন মিস ওয়ান্ডার।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে বললেন, 'নাহ্, হবে না এখানে। শোনো, তোমরা নেমে যাও। মিছিলে যোগ দাওগে। আমি অন্য কোনখানে গাড়িটা রেখে আসছি। রবিনকে বলবে, ও যা করেছে, আরেকটু হলে হার্ট-অ্যাটাক হয়ে যেত আমার।'

পনেরো

ভিড়ের চাপে ফ্লোটের কাছে এগুনো কঠিন হয়ে গেল দুই গোয়েন্দার জন্যে। গুঁতোগুঁতি করে ভিড় থেকে যা-ও বা বেরোল, কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়াল ভ্রাম্যমান হট-ডগ আর আইসক্রীমের ভ্যান। ছোটাছুটি করে এল ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। ওদের কাছে সরে এল এক বেলুনওয়ালা। বেলুন বিক্রি করতে গিয়ে ভিড় আরও বাড়িয়ে দিল।

'ঘেমে গেছি,' মুসা বলল। 'একটা আইসক্রীম খেয়ে নিই।'

'সময় নেই,' বাধা দিল কিশোর। 'ওই যে, মিছিল আবার চলা শুরু করেছে।'

সামনের ফ্লোটগুলো ধীরে ধীরে আবার চলতে শুরু করেছে রাস্তা ধরে। জোরাল বাজনার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে। তার সঙ্গে মিশেছে উল্লসিত কোলাহল আর করতালি। উৎসবের আনন্দে যেন হাসছে ব্যানারগুলো। সামনের ফ্লোটের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল হলুদ ফোলানো পোশাক পরেছে, লাগছে মুরগীর ছানার মত।

পরের ফ্লোটটা সাজানো হয়েছে ভিকটোরিয়ান স্টাইলে। ছেলেমেয়েরা পরেছে ওই আমলের পোশাক। বড় করে ব্যানার লাগিয়েছে, তাতে লেখা রকি বীচ অ্যামেচার ড্রামাটিকস সোসাইটি।

সামরিক বাহিনীর বিউগল আর বাজনা শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দুই গোয়েন্দা দেখল, চমৎকার ভাবে মার্চ করে এগিয়ে আসছে কিশোর সেনাবাহিনীর একটা খুদে দল। এটাও আরেকটা ফ্লোট।

গায়ে গায়ে লেগে থাকা দর্শকদের ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে বেরিয়ে গেল মুসা। এগিয়ে গেল ধীর গতিতে এগোনো ফ্লোটের মিছিলের দিকে। নিজেদের ফ্লোটটা খুঁজছে। পেছনে তাকিয়ে কিশোরকে বলল চিৎকার করে, 'পরে দেখা হবে। আমি ফ্লোটে যাচ্ছি।'

কাঁধের ওপর ক্যামকর্ডার তুলে নিল কিশোর। সবচেয়ে সামনের ফ্লোটটার ওপর ফোকাস করল। ভিউ ফাইন্ডারে লাফ দিয়ে যেন উঠে এল অতি খুদে খুদে হলুদ মুরগীর ছানারা। পাশ থেকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল কে যেন। চোখের সামনে থেকে সরে গেল ছানাগুলো।

প্রচুর লোক। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করছে। তাদের কাছ থেকে না সরলে ছবি তুলতে পারবে না। সামান্য সামনে এগোল কিশোর। আবার ফোকাস করল ফ্লোটের ওপর। ড্রামাটিকস সোসাইটির ভাল একটা শট নেবার ইচ্ছে। হাসি হাসি মুখগুলো ফুটে উঠেছে ভিউ ফাইন্ডারে। তবে শট ভাল হবে না। সুবিধেমত একটা জায়গার জন্যে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে।

মোড়ের দিকে এগোল। মেইন রোড ধরে এগিয়ে আসা পুরো মিছিলটাকে

চোখে পড়ছে এখান থেকে। সামরিক বাহিনীর বিউগল আর ড্রামের বিকট শব্দে কান ঝালাপালা। আগে আগে চলেছে একজন ড্রাম-মেজর।

চমৎকার একটা শট নিল কিশোর। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। আরও সামনে এগিয়ে গেল সে, তবে মোড়ের কাছ থেকে সরল না। মিছিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে থাকল।

দূরে, মিছিলের বেশ অনেকটা পেছনে নিজেদের ফ্লোটের গাছ চোখে পড়ল তার। খানিকটা ওপরে যদি ওঠা যেত, আরও ভাল করে শট নেয়া যেত। পেছনে একপাশে লাইটপোস্টের নিচে একটা ওএইস্ট পেপার বিন দেখে কাছে এগিয়ে গেল। খুব সাবধানে ভারসাম্য রক্ষা করে ওপরে উঠল ওটার। একহাতে থামটা পেঁচিয়ে ধরেছে। ক্যামেরাটা ঝুলছে গলায়।

হ্যাঁ, হয়েছে। এখান থেকে অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্কুলের ফ্লোটটা। রবিনকে দেখা গেল। রামধনু রঙের পোশাক আর মুখে চকচকে সান মাস্ক পরে ফ্লোটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে রঙিন বল নিয়ে লোফালুফি করে যাচ্ছে ভোজবাজির দক্ষ খেলোয়াড়ের মত। বলগুলো ছুঁড়ে দিয়ে নিখুঁত ভাবে ধরে ফেলছে একের পর এক, একটিবারও মিস হচ্ছে না। ভালমত প্র্যাকটিস করেছে, বোঝা যায়।

আবার ক্যামেরা তুলে জুম করল কিশোর। ভিউ ফাইন্ডারে ফুটে উঠল নাচতে নাচতে এগিয়ে যাওয়া মরিস-ড্যান্সারদের; তাদের পেছনে জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরা দলটা হেলেদুলে চলেছে। কেউ কেউ পরেছে মধ্যযুগীয় পোশাক। কেউ বুড়ো, কেউ ছোট; বুড়োরা আসলে বুড়ো নয়, বুড়ো সেজেছে।

হেসে ফেলল কিশোর। ভিউ ফাইন্ডারে দেখা দিয়েছে ভাঁড়, বেলুন লাগানো লাঠি দিয়ে সমানে পিটিয়ে চলেছে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই।

গাছ লাগানো ফ্লোটে নজর ফেরাল কিশোর। বল ছুঁড়ে দেয়া রানীর ওপর স্থির হলো লেন্স।

আগের চেয়ে দ্রুত বল ছুঁড়ছে রবিন। আলাদা করে চেনাই যাচ্ছে না আর এখন বলগুলোকে। কেবল তিনটে রঙের ঝিলিক। নিখুঁত ভাবে ছুঁড়ছে আর ধরছে। একটিবারের জন্যে ফসকাচ্ছে না। একটিবারের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে না।

জুম বাটনটা টিপে ছবি যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করল কিশোর। রানীর হাত দুটোর ওপর ফোকাস করল–এক হাতের আঙুল স্প্রিঙের মত ছেড়ে দিচ্ছে বলগুলোকে, অন্য হাত কাপের মত হয়ে লুফে নিচ্ছে। পাতলা, রোগাটে হাত। রোগাটে আঙুল। একটা আঙুলে আংটি।

রবিন আংটি পরে না!

মুখোশের ওপর ফোকাস করল কিশোর। চকচকে সোনালি সূর্যটার নিচে কার মুখ লুকানো রয়েছে বলা অসম্ভব। রঙিন পোশাকের আড়ালে কার শরীর লুকিয়ে আছে, তা-ও বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু আর যে-ই হোক, রবিন নয়, নিশ্চিত হয়ে গেছে সে। বুকের মধ্যে

কাঁপুনি শুরু হয়েছে।

ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে মুসাকে খুঁজল কিশোরের চোখ।

রাস্তার ওদিকটায় পুলিশের বেষ্টনী নেই। পেছনের দর্শকদের চাপে সমান থাকতে পারছে না সামনের সারি, ভেঙে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সবাই সামনে আসতে চায় ভাল করে দেখার জন্যে।

ভাঁড়ের লাল বেলুনগুলো চোখে পড়ল কিশোরের। রাস্তার ধারে দর্শকদের কাছাকাছি চলে গেছে মুসা। বেলুন দিয়ে বাড়ি মারছে দর্শকদের মাথায়। হেসে অস্থির হচ্ছে ওরা। ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত। কব্জি চেপে ধরল মুসার। টেনে সরিয়ে নিল একপাশে। এক মুহূর্ত থামল। তারপর আবার টেনে নিয়ে চলল। চলে গেল প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরও সরিয়ে ফেলেছে ক্যামেরার চোখ। মুসার পাশ ঘেঁষে আছে লোকটা। চেপে রয়েছে গায়ের ওপর।

লোকটা কন ডিকি। কিছু বলছে মুসাকে। মাথা নাড়ছে মুসা। ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল।

বিন থেকে লাফ দিয়ে নেমে ওদের দিকে দৌড় দিল কিশোর।

স্কুলের ফ্লোটটার পাশ কাটিয়ে এল। লোকের চিৎকার, হাসাহাসি, বাজনার শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়।

মুসাকে দেখতে পেল না আর কিশোর। ফ্লোট, নেচে নেচে এগুনো ছেলেমেয়ের দল, জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ ভিউ ফাইন্ডারে ফুটছে আর সরছে। কিন্তু মুসা নেই।

চোখের সামনে থেকে ক্যামেরা সরিয়ে তাকাল সে। জনতার মাথার ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

ওই যে! অসংখ্য মাথার ওপর বাতাসে কাঁপছে একগুচ্ছ লাল বেলুন। কিন্তু মুসাকে চোখে পড়ল না।

ভিড় ঠেলে এগোনোর চেষ্টা করল সে।

কঠিন একটা হাত তার বাহু ধরে ঠেলে ফেলে দিল পেছনে। সরিয়ে দিল বেলুনগুলো থেকে দূরে।

কে সরাল দেখার জন্যে ফিরে তাকাল। চোখে পড়ল একটা হরিণের মুখোশ। মুখোশের নিচে কার মুখ রয়েছে দেখতে পেল না। ফুটো দিয়ে চোখজোড়া কেবল দেখা যাচ্ছে।

হেসে উঠল একটা কণ্ঠ। আবার হাত ধরে টান মারল আরেকজন। চিৎকার করে বলল, 'কিশোর, এসো আমাদের সঙ্গে।'

'ছাড়ো! ছাড়ো!'

'আরে, এসো না। খালি কি ছবিই তুলবে নাকি?' হাসতে হাসতে বলল কণ্ঠটা।

'আহ্, ছাড়ো না!' মোচড় দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। কাঁধ দিয়ে ঠেলা মারতে মারতে ঢুকে পড়ল দর্শকের ভিড়ে। বিরক্ত হয়ে চেঁচাতে লাগল দর্শকরা। বকাবকি করতে লাগল ওকে।

থামল না কিশোর। মাথার ওপরে এখনও দেখা যাচ্ছে লাল বেলুনগুলো। তিল তিল করে এগিয়ে চলল ওগুলোর দিকে।

চাপ কিছুটা কমল অবশেষে। মূল ভিড়টা থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। বোতলের মুখের ছিপির মত ছিটকে বেরোল বাইরে; উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে বাঁচল। একটা দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। চোখ খুঁজছে বেলুনগুলোকে।

চারপাশে ঘিরে আছে হাসিখুশি মুখগুলো। হাসছে, হুল্লোড় করছে, আইসক্রীম আর ক্যান্ডি খাচ্ছে।

কিন্তু লাল বেলুনগুলোকে চোখে পড়ল না ওর।

ষোলো

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল কিশোরের। আবার চোখে পড়ল বেলুনগুলো। যে সাইড স্ট্রীটটাতে বেরিয়ে এসেছে, সেটাতেই কিছুদূরে দাঁড়ানো একটা আইসক্রীম ভ্যানের অন্যপাশে দর্শকদের মাথার ওপর।

দৌড় দিল সে। এঁকেবেঁকে, রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষগুলোর পাশ কেটে। হৃৎপিণ্ডটা উঠে এসেছে যেন গলার কাছে, উদ্বেগে কেমন ঘোলা হয়ে গেছে মাথার ভেতরটা।

ভিড় ঠেলে এগুলো বেলুনগুলোর কাছে।

হতাশ হলো। ছোট একটা ছেলে একগুচ্ছ লাল বেলুন তুলে রেখেছে মাথার ওপর।

মুসা ভেবে ছুটে এসেছিল কিশোর। ধাক্কার চোটে এসে পড়ল ছেলেটার গায়ে। তার বেলুন বাঁধার সুতোয় হাত লাগল। টান লেগে ছেলেটার হাত থেকে ছুটে গেল সুতোটা। লাফ দিয়ে আকাশে উঠে গেল বেলুন। চিৎকার করে উঠল ছেলেটা।

'সরি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'খুবই দুঃখিত আমি। আমি ভেবেছি...'

আবার ভিড় ঠেলে পিছিয়ে এল সে। আইসক্রীম ভ্যানটার পাশ কাটিয়ে এল। চারদিকে বেলুনের ছড়াছড়ি। লাল, হলুদ, নীল, সবুজ বেলুন, হাসিখুশি মানুষের মুখ আঁকা বেলুন, হৃৎপিণ্ডের মত করে তৈরি রূপালী রঙ করা বেলুন। বেলুন আর বেলুন। বেলুনের ঝাঁক নাচানাচি করছে মাথার ওপর।

দূরে এক ঝলক লাল রঙ চোখে পড়ল। রাস্তাটার শেষ মাথায়। দেখতে না দেখতেই হারিয়ে গেল পথের মোড়ে।

সেদিকে দৌড় দিল কিশোর। ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে মানুষজন সরিয়ে পথ করে নিতে লাগল। অবাক চোখে তাকাচ্ছে সবাই। গলায় ঝোলানো ভারী ক্যামকর্ডারটা বাড়ি মারছে পিঠে, কোমরে। গতি কমিয়ে দিচ্ছে তার।

মোড়ের কাছে এসে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেল সে।
রাস্তায় অলস ভঙ্গিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে একটা বেলুন। লাঠির মাথায় বাঁধা লাল বেলুন।

খুব আনন্দে আছে মুসা।
ভাঁড়ের পোশাক আর মুখে রঙ মেখে লোকের সামনে আসার অস্বস্তিটা কেটে যেতেই মজা পাওয়া শুরু করেছে সে। স্কুল-ফ্লোটের আশেপাশে ছোটাছুটি করে লোকের মাথায়, গায়ে বাড়ি মারছে। চমকে উঠছে লোকে। গাল দেয়ার জন্যে ফিরে তাকিয়ে সামনে ভাঁড় দেখে থমকে যাচ্ছে। হেসে উঠছে মুসা। নতুন শিকারের আশায় তাকাচ্ছে চারদিকে। একবার যাকে মেরেছে তাকে আর দ্বিতীয়বার মেরে মজা নেই।
বাজনাটা সংক্রামক। তালে তালে আপনাআপনি পা উঠে যায়। এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তারও উঠছে।
দর্শকদের সারির দিকে ছুটে গেল সে। বেলুন বুলিয়ে দিল তাদের মাথায়।
হাতটা বেরিয়ে এল হঠাৎ। চেপে ধরল তার কব্জি। বেলুন বোলানোয় এতটাই মগ্ন ছিল সে, চমকে গেল। কার হাত বুঝতে সময় লাগল।
'টম তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়,' কানের কাছে হিসহিস করে উঠল কন ডিকির কণ্ঠ। মোরগের মত ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে আছে সে। 'রবিন জখম হয়েছে। তোমার যাওয়াটা জরুরী।'
চট করে ফ্লোটের দিকে চোখ চলে গেল মুসার। 'ওর আবার কি হলো? ওই তো দাঁড়িয়ে আছে।'
'ও রবিন নয়। এসো আমার সঙ্গে,' হাত ধরে টান দিল ডিকি। জোরাজুরি শুরু করল। বাধা দিল মুসা। যেতে চাইছে না। শীতল আঙুলগুলোর চাপ কঠিন হলো কব্জিতে। 'এসো আমার সঙ্গে। তোমার সাহায্য দরকার...'
'রবিন নয়!...তাহলে কে...'
কথা শেষ করতে পারল না মুসা। হ্যাঁচকা টানে দর্শকদের ভিড়ে ওকে ঢুকিয়ে ফেলল ডিকি। চারপাশের মানুষগুলোর মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকিয়ে পলকের জন্যে দেখল ওদের দিকে দৌড়ে আসছে কিশোর।
ওর সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগ নেই। ভিড় মুসাকে আপনাআপনি ঠেলে দিচ্ছে পেছন দিকে। বেরিয়ে এল, কিংবা বলা ভাল, বের করে দেয়া হলো ওকে একটা সাইড স্ট্রীটে। এখানে ভিড় পাতলা।
'রবিনের কি হয়েছে?' জানতে চাইল সে। 'কোথায় ও?'
'সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। আর কোন প্রশ্ন নয়,' কর্কশ হয়ে উঠল ডিকির কণ্ঠ। মুসার গায়ে চেপে এল সে। শক্ত কিছুর খোঁচা লাগল পেটের একপাশে। ঘাড় কাত করে তাকিয়ে দেখল একটা ছুরির চকচকে ফলা। ডিকি বলল আবার, 'চেঁচাবে না।'

আর বাধা দিল না মুসা। ডিকির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।
'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'
'তোমাদের বাড়িতে। তোমার বন্ধুকেও ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'
'কেন?'
জবাব দিল না ডিকি।
একটা মোড় ঘুরতে মুসার কব্জিতে শক্ত হলো আবার আঙুলগুলো। চাপা স্বরে গর্জে উঠল ডিকি, 'কোন চালাকি নয়, বুঝেছ?'
একটা গাড়ির কাছে মুসাকে নিয়ে এল ডিকি।
ধড়াস করে এক লাফ মারল মুসার হৃৎপিণ্ড। আশার আলো জ্বলল মনে। সাইকেল চালিয়ে ওদের দিকে আসতে দেখল বিডকে।
গাড়ির অন্য পাশে এসে ব্রেক কষে মাটিতে পা নামিয়ে দিল বিড।
'মুসা, এখানে কি করছ?'
কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল মুসা। কিন্তু ওর আগেই জবাব দিয়ে দিল ডিকি, 'মুসার আম্মা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'
'ও,' উদ্বেগ ফুটল বিডের চেহারায়। 'বেশি খারাপ?'
তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগল মুসার পেটে। 'না, কনি। কিশোরের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বোলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে।'
শূন্য দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকাল বিড। 'বলব!'
একটানে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে ফেলল বিড। মুসার কাঁধ ধরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। হাত থেকে বেলুন বাঁধা লাঠিটা খসে গেল মুসার। পড়ে গেল রাস্তায়।
'অতটা খারাপ নয়,' বিডের দিকে তাকিয়ে বলল ডিকি। প্যাসেঞ্জার ডোর লাগিয়ে ঘুরে গিয়ে অন্যপাশের দরজা খুলল। 'তোমার কাজ তুমি করোগে। মুসাকে আমি দেখব।'
প্যাসেঞ্জার সীটে ভাঁজ করে ফেলে রাখা হয়েছে একটা ম্যাপ। তার ওপরই বসে পড়েছে মুসা। টেনে বের করল নিচ থেকে। ম্যাপটা এমন ভাবে ভাঁজ করা হয়েছে, রকি বীচের একটা অংশ বেরিয়ে আছে।
ডিকি কথা বলছে বিডের সঙ্গে। কয়েক সেকেন্ড সময় পাওয়া গেছে। সুযোগটা কাজে লাগাল মুসা। পকেট থেকে মিস ওয়ান্ডারের দেয়া লিপস্টিকটা বের করল। সেটা দিয়ে ম্যাপে দ্রুত একটা গোল দাগ দিল। ওদের বাড়িটা যে গলিতে রয়েছে, সেটাতে। বুঝিয়ে দিল তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর ম্যাপটা একপাশে রেখে দিল, দরজার কাছাকাছি।
সাইকেলে বসে থেকে পাশের জানালা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে বিড।
'বাই, কনি,' বিডের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। ছুরিটা ধরা নেই এখন। ইচ্ছে করলে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রবিনের ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে ওর কাছে। নিশ্চয় ও কোন বিপদে পড়েছে। তার কাছে যাওয়া দরকার।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ওর কাছে যাওয়া হবে না। ডিকি তাকে ফেলে রেখেই পালাবে। রবিনকে এখন যেখানে রেখেছে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলবে।

গাড়িতে উঠে দড়াম করে দরজা লাগাল ডিকি। স্টার্ট দিল। এমন করে গাড়ি পিছাতে শুরু করল, বিডের সাইকেলেই বাড়ি লাগার অবস্থা।

তাড়াতাড়ি প্যাডাল করে সরে গেল সে।

আচমকা দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা। খুলে ফেলল কয়েক ইঞ্চি। চোখের পলকে ছুটে এল ডিকির হাত। টান দিয়ে বন্ধ করে ফেলল আবার দরজাটা।

'খবরদার!' গর্জে উঠল ডিকি। 'আরেকবার খোলার চেষ্টা করে দেখো খালি! মারা পড়বে বলে দিলাম!'

সীটে হেলান দিল মুসা। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে ডিকির দিকে। তবে তার কাজ সে সেরে ফেলেছে। দরজাটা ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ফেলে দিয়েছে ম্যাপটা।

সতেরো

মোড়ের কাছে বিডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর। চলন্ত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে বিড।

তার কাছে দৌড়ে এল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আটকালে না কেন? কোথায় নিয়ে গেল মুসাকে?'

বিমূঢ়ের মত কিশোরের দিকে তাকাল বিড। 'লোকটা তো বলল, মুসার আম্মার নাকি অসুখ। আমাকে কনি বলে ডাকল মুসা। অবাক লাগছিল। আমি ভাবলাম, ভাঁড় সেজেছে তো, এটাও কোন ধরনের রসিকতা।'

'রসিকতা!' বুঝতে পেরে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'মোটেও না! ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোথায় নিয়ে গেছে জানো কিছু?'

'বলল তো হাসপাতালে···রাখো, রাখো, দরজা দিয়ে কি যেন ফেলেছে মুসা। দাঁড়াও, দেখে আসি।'

সাইকেল ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল বিড। পেছনে ছুটল কিশোর। ওর আগেই ম্যাপটা তুলে নিল বিড। বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে।

ম্যাপে লিপস্টিকের দাগটা দেখল কিশোর। 'মুসাদের বাড়ির রাস্তা। ওখানেই গেছে। পুলিশকে জানানো দরকার। জলদি! শিওর, রবিনকেও ওখানেই নিয়ে গেছে ওরা।'

'রসিকতা করছ না তো? আমাকে ঠকানোর জন্যে?' দ্বিধা যাচ্ছে না বিডের। 'রবিন তো রয়েছে ফ্লোটের ওপর, তাই না?'

'না। ফ্লোটে যে আছে সে রবিন নয়। আমার ধারণা, ও টমের মা। দেখি,

সাইকেলটা দাও তো তোমার।' হ্যান্ডেল ধরে মোচড় দিয়ে বিডের হাতটা সরিয়ে দিল গ্রিপ থেকে। তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিল সীট থেকে।

বোকার মত তাকিয়ে আছে বিড। 'কিশোর, কি করছ...কোথায় যাবে?'

লাফ দিয়ে সীটে চড়ে বসল কিশোর। প্যাডালে চাপ দিল। ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'রবিনদের বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি পুলিশে খবর দাওগে, জলদি!'

বিডকে বুঝিয়ে বলার সময় নেই। দ্রুত প্যাডাল করে চলল সে। মুসাদের অনুসরণ করে কি হবে, সেটাও জানে না। শুধু জানে, মুসা আর রবিন ভয়ানক বিপদে পড়েছে। সময়মত ওদের কাছে পৌঁছতে হবে।

তীরবেগে ছুটছে সাইকেল।

মুসাদের বাড়ির পঞ্চাশ গজ দূরে এসে সাইকেল থামাল সে। হ্যান্ডেলবারে ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগল ডাঙায় তোলা মাছের মত হাঁ করে। পা দুটোতে মনে হচ্ছে কোন সাড় নেই। অবশ।

সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে এনে ঠেস দিয়ে রাখল পাতাবাহারের বেড়ায়। পা বাড়াল মুসাদের গেটের দিকে। এত উত্তেজনার মধ্যেও সামান্যতম অসতর্ক হয়নি।

ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে গাড়িটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চট করে বসে পড়ল একটা ইঁটের থামের আড়ালে। স্টীয়ারিঙে বসা লোকটার দিকে নজর।

বড় বড়, ভারী কয়েকটা দম নিল কিশোর। শরীরটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। আস্তে মাথা তুলে তাকাল আবার।

গাড়িতে বসে আছে টম।

চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। গেটের বাইরের লম্বা, ঢালু রাস্তাটা একেবারে নির্জন। সবাই চলে গেছে ফেসটিভ্যালে। পাহারা দিচ্ছে টম। তার চোখ এড়িয়ে সামনের দরজার কাছে যাওয়ার উপায় নেই।

পিছিয়ে এল কিশোর। সরে চলে এল খানিক দূরের ছাউনিটার দিকে। ওটার পাশ দিয়ে ঘুরে চলে এল বাড়ির পেছনে। দুটো ঘরের মাঝখানে বাগান। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, এটা পেরোতে গেলে টমের নজরে পড়বে কিনা। তারপর ক্যামকর্ডারটা শক্ত করে চেপে ধরে মাথা নিচু করে দিল দৌড়।

পেছনের দরজায় তালা দেয়া। এটাই আশা করেছিল। অন্য একটা চিন্তা এল মাথায়।

আবার ছুটল। চলে এল বড় একটা জানালার কাছে। ভেতরে উঁকি দিল। এ ঘরে বসেই পার্টির দিন গ্রেট মিসটিরিয়োসোর জাদু দেখেছিল।

চুরি করার পর যে কাঁচটা ভেঙে রেখে গিয়েছিল চোর, সেটা আটকে দেয়া হয়েছে এক টুকরো প্লাইউড দিয়ে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না।

বাড়ির পাশে সাজিয়ে রাখা বড় বড় ফুলের টবের একটাকে টেনে নিয়ে এল জানালার নিচে। কিনারে পা রেখে উঠে দাঁড়াল। কাত হয়ে পড়ে যাবার ভয় আছে। কোনমতে ভারসাম্য বজায় রেখে নখ দিয়ে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করল

প্লাইউডে বসানো পেরেক।

অসম্ভব কাজ। যন্ত্র ছাড়া হবে না। চারপাশে তাকাতে লাগল। বাগানে কাজ করার পুরানো কতগুলো যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। পুরানো, মরচে ধরা একটা কর্ণিক তুলে এনে চাড় মেরে সরু মাথাটা ঢুকিয়ে দিল প্লাইউড আর জানালার ফ্রেমের ফাঁকে। চাপ দিতে শুরু করল।

মচমচ আওয়াজ হতে লাগল। চাপ ছাড়ল না সে। পেরেক ছুটল না, প্লাইউডটাই গেল ভেঙে। আচমকা ঝাঁকি লেগে ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে গেল টব। পড়ে যেতে যেতে জানালায় হাত রেখে কোনমতে সামলে নিল সে। পায়ের ধাক্কায় সোজা করল আবার। ভাঙা ফোকর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানিটা খুঁজতে লাগল।

আধ মিনিটের মধ্যে ঘরে ঢুকে পড়ল। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে।

কাছেরই কোন ঘর থেকে ভেসে এল কথার শব্দ। নিঃশব্দে হল পেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা আধখোলা দরজার সামনে।

এদিকে পেছন করে বসে আছে কন ডিকি। এক হাত দিয়ে খামচে ধরেছে চেয়ারের হেলান, আরেক হাত ঝুলছে একপাশে, আলতো করে ধরে রেখেছে একটা ছুরি। তার সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছে মুসা আর রবিনকে। চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা।

'...আমি সেজন্যে ভাবছি না,' কন ডিকি বলছে। 'ওকেও ধরব আমরা। তিনজনকেই আটকাব।'

ঝিলিক দিয়ে উঠল রবিনের চোখ। কিশোরকে দেখে ফেলেছে।

'কিশোরকে আপনি চেনেন না। কিছুতেই ধরতে পারবেন না,' ডিকির চোখে চোখ রেখে বলল রবিন। 'এই মুহূর্তে নিশ্চয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে সে।'

মুসাও দেখেছে কিশোরকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল। ডিকির সন্দেহ জাগাতে চায় না।

'তা ঠিক,' রবিনের কথায় সুর মেলাল মুসা। 'যেই দেখবে, মিছিলে আমি নেই, সব বুঝে ফেলবে সে। ক'দিন থেকেই আপনাদের ওপর নজর রয়েছে আমাদের।'

'আমি হলে হাল ছেড়ে দিতাম এতক্ষণে,' রবিন বলল। 'ভাল চাইলে ওপরতলায় আপনার সঙ্গীর কাছে চলে যান।'

সিঁড়ির দিকে ঘুরে গেল কিশোরের চোখ। রবিনের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে। কন ডিকি একা নয় বাড়িতে।

'সে দেখা যাবে,' ডিকি বলল। 'যাই, টমকে গিয়ে বলে আসি তোমাদের বন্ধুকে নিয়ে আসার জন্যে।' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সে।

'আমাদের নিয়ে কি করার ইচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানলে খুশি হবে না। তবে একটা কথা নিশ্চিত জেনে রাখো, পুলিশ আসার অনেক আগেই এখান থেকে বহুদূরে চলে যাব আমরা। হয়তো সেটা

দেখার ভাগ্যও তোমাদের হবে না।'

'এ সব করে পার পাবেন না,' কঠিন স্বরে বলল রবিন।

হেসে উঠল ডিকি। হাসিটা ভয়ঙ্কর।

দরজার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে শুনে নিঃশব্দে দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়িতে উঠে লুকিয়ে পড়ল।

পায়ের শব্দে বুঝল, হলঘরে ঢুকেছে ডিকি।

ওপর থেকে শোনা গেল আরেক জোড়া পায়ের শব্দ। মুসার আম্মার বেডরূমে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ।

পা টিপে টিপে ল্যান্ডিঙে উঠে এল কিশোর। দরজা খোলা। ভেতরে উঁকি দিল। একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার টেনে খুলে তার মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করছে টমের বাবা মার্ক জুবের। মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলেছে কাপড়-চোপড়, নানা জিনিস।

একা ওর সঙ্গে পারবে না। তবে ও কিছু বোঝার আগেই দরজাটা আটকে দিতে পারে।

দম বন্ধ করে হাত বাড়াল কিশোর। শব্দ হলে আর রক্ষা নেই। মুহূর্তে ছুটে এসে চেপে ধরবে তাকে।

নেবার মত কিছু না পেয়ে গজ গজ করছে মার্ক। ঠেলা মেরে ড্রয়ারটা লাগিয়ে দিয়ে আরেকটা ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়াল।

তালার ভেতরের দিকের ফুটোয় ঢুকিয়ে রাখা চাবিটা লাগল কিশোরের আঙুলের মাথায়। ঠাণ্ডা, ধাতব স্পর্শ। টেনে খুলে আনা একটা ভীষণ কঠিন কাজ মনে হলো এমুহূর্তে।

আরেকটু এগোতে গেল সে। একই সঙ্গে টান দিল চাবিটা ধরে। কাঁধ থেকে পিছলে গেল ক্যামকর্ডারের ফিতে। বাড়ি লাগল দরজায়। সামান্য শব্দ। কিন্তু কিশোরের মনে হলো যেন বোমা ফাটল।

চাবিটা খুলে চলে এসেছে হাতে। ঝটকা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে জুবের। চোখে চোখ পড়ল দু'জনের।

হাতল ধরে একটানে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। চাবি ঢুকিয়ে দিল তালার ফুটোয়। ভেতরে শোনা গেল জুবেরের গর্জন। দুপদাপ করে ছুটে আসছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার গায়ে। এত জোরে শব্দ হলো, মনে হলো ভেঙে যাবে দরজা।

তালা লাগিয়ে দিয়েছে কিশোর। সন্তুষ্ট হয়ে আপনমনে বলল : যাহ্, একটা গেল!

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামতে লাগল সে। সামনের দরজাটা খোলা। ডিকিকে দেখা যাচ্ছে না।

এত দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে বোধহয় আর কোনদিন নামেনি। কোন দিকে না তাকিয়ে, আছড়ে পড়ে পা ভাঙার পরোয়া না করে সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এল সে। ছুটল যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে মুসা আর রবিনকে। ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল।

'চাবি আছে এ ঘরের?' জানতে চাইল।

'না,' মাথা নাড়ল মুসা। চোখের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'ওটা দিয়ে ঠেস দাও।'

তাড়াতাড়ি গিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এল কিশোর। এমনভাবে রাখল, যাতে দরজার হাতলের নিচটা চেয়ারের হেলানে আটকে যায়। অন্যপাশ থেকে ঘোরাতে পারবে না আর হাতলটা। তালার কাজ দেবে।

মুসার বাঁধন খুলতে শুরু করল সে। গিঁট ঢিলে হয়ে এসেছে, এই সময় অন্যপাশে চিৎকার শোনা গেল। কন ডিকির গলা নয়, ওপর থেকে আসছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে মার্ক জুবের।

'ডিকি!' বলছে সে, 'আমাকে আটকে দিয়েছে! জলদি এসো!'

দ্রুত হাত চালাল কিশোর। মুসার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে ছুটে গেল রবিনের দিকে। পায়ের বাঁধন মুসা নিজেই খুলতে পারবে।

রবিনের কব্জিটা সবে মুক্ত করেছে, দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কে যেন। হ্যান্ডেল ঘোরানোর চেষ্টা করছে। সামান্য কাত হয়ে গেল চেয়ারটা। ভয় হলো, পড়ে যাবে। কিন্তু কার্পেটে আটকে গেল চেয়ারের পায়া। যেটুকু কাত হয়েছে তার বেশি আর হলো না। হাতল যেটুকু ঘুরেছে তাতে খুলবে না দরজা।

কাঁধের জোরাল ধাক্কা পড়তে লাগল পাল্লার গায়ে।

শঙ্কিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে রবিন বলল, 'ভাঙতে পারবে না, কি বলো?'

'না, পারবে না,' মুসা বলল। তবে জোর নেই গলায়। আঙুল তুলে আরেকটা আধখোলা দরজা দেখাল। রবিন আর কিশোরও দেখল, ডাইনিং-রুমটা দেখা যাচ্ছে।

'ওদিক দিয়ে আসতে পারে!' আবার বলল মুসা।

বলতে না বলতেই একটা ছায়া পড়ল দরজার ওপাশে।

দরজায় দেখা দিল কন ডিকি। মুখ-চোখ লাল। হাতের বাঁকা ফলাওয়ালা ভয়ানক ছুরিটা খোঁচা মারার ভঙ্গিতে তুলে রেখেছে।

আঠারো

ওরা যেমন চমকে গেছে, ওদের দেখে ডিকিও চমকে গেছে। দাঁড়িয়ে গেল। সময় নষ্ট হলো তাতে।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। এক লাফে চলে গেল দরজার কাছে। ডিকির মুখের ওপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা।

মুসাও উঠে পড়েছে। একটা চেয়ার ঠেলে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরল হাতলের নিচে। প্রথম দরজাটা যেভাবে আটকানো হয়েছে, এটাকেও সেভাবেই

আটকে দিল।

'ফোনটা কই?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল রবিন। 'পুলিশকে ফোন করা দরকার।'

'ওটা তো হলঘরে,' মুসা বলল।

'তাহলে উপায়? বেশিক্ষণ তো আটকে রাখা যাবে না এদের।'

'জানালা!' বলেই চেয়ারের পায়ায় কষে এক লাথি মারল মুসা, হেলানটা আরও শক্ত করে লাগিয়ে দিল হাতলের সঙ্গে। তারপর ছুটল জানালার দিকে।

বন্ধ দরজায় যেন বাজ পড়ল। জোরে জোরে ধাক্কা মারছে।

'মুসা, কি করছ?' পেছন থেকে জানতে চাইল কিশোর।

জানালার ছিটকানি খোলার চেষ্টা করছে মুসা। বহুদিন খোলা হয় না বলে মরচে পড়ে আটকে গেছে।

'নাহ্, নড়ছেও না,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'একটা স্ক্রু-ড্রাইভার হলে চেষ্টা করে দেখা যেত। চাড় মেরে...'

'আনো তাহলে স্ক্রু-ড্রাইভার,' রবিন বলল।

'এ ঘরে কোথায় পাব?'

বিচিত্র একটা শব্দ হতে ঘুরে তাকাল তিনজনেই। কার্পেটের সঙ্গে আটকে যাওয়া প্রথম চেয়ারটা কার্পেট সহই সরতে আরম্ভ করেছে। ঘুরে গেল হাতল। ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা। একটা হাত দেখা গেল, দরজার কিনার ধরে রেখেছে।

দৌড়ে গিয়ে ক্যামকর্ডারটা দিয়েই ঘুরিয়ে বাড়ি মারল কিশোর। রাগে, ব্যথায় আর্তচিৎকার করে উঠল হাতের মালিক। দরজা ছেড়ে দিল হাতটা।

'পুলিশ আসছে!' ভয় দেখানোর জন্যে চিৎকার করে বলল কিশোর। 'যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে!'

কন ডিকিও সমানে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে দরজার গায়ে। ঠেলা, ধাক্কা, লাথি, হাতল ঘোরানোর জন্যে চাপাচাপি–যে ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে সে, পাল্লা খুলতে দেরি হবে না। দু'দিক থেকে যদি ছুরি-পিস্তল নিয়ে আক্রমণ চালায় শত্রুরা, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গতি থাকবে না গোয়েন্দাদের।

কাত হয়ে গেল চেয়ার। ঘুরতে শুরু করল হাতল। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দরজা।

দৌড়ে এল মুসা আর রবিন। হাতে বাড়ি খাওয়া অন্যপাশের লোকটা আবার ঢোকার চেষ্টা চালানোর আগেই ঠেলা মেরে লাগিয়ে দিল পাল্লা। চেয়ারটা ঢুকিয়ে দিতে গেল হাতলের নিচে।

'না না, লাগিয়ো না!' বাধা দিল কিশোর।

অবাক হলো দুই সহকারী। কি আছে গোয়েন্দাপ্রধানের মনে? কি করতে চায়?

আবার ফাঁক হয়ে গেল দরজা। খুলতে শুরু করল।

চেয়ারটা তুলে নিল কিশোর।

ঝটকা দিয়ে হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজা। তাল সামলাতে না পেরে সামনের দিকে সামান্য বাঁকা হয়ে গেল কন ডিকির শরীর। মাথাটা ঝোকানো।

কোন রকম দ্বিধা করল না কিশোর। চেয়ার দিয়ে বাড়ি মারল ডিকির মাথায়। সোজা হওয়ারও সুযোগ পেল না ডিকি। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কার্পেটে।

'মর্ ব্যাটা!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল মুসা। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোকটার ওপর দিয়ে লাফ মেরে চলে এল অন্যপাশে। কিশোর আর রবিন তার আগেই পার হয়ে গেছে। হুড়মুড় করে ডাইনিং-রূমে ঢুকল তিনজনে। দরজার দিকে ছুটল। ওটা দিয়ে হলঘরে ঢোকা যায়।

কিন্তু সামনের দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে টম। হাতে বাড়ি খেয়ে আর ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেনি। এখনও হাত ডলছে। ওদের দেখে ডিকির নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল।

ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দ হলো। টম যে দরজাটা খোলার চেষ্টা করেছিল, সেটা খুলে বেরিয়ে এল ডিকি। রাগে জ্বলছে চোখ।

'দোতলায়!' বলেই সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল মুসা।

ছুটল তিনজনে।

পেছন থেকে কিশোরের জ্যাকেট খামচে ধরল ডিকি। ফিরে তাকানোর সময় নেই। ক্যামকর্ডারটা ঘুরিয়ে আন্দাজেই বাড়ি মারল কিশোর। থ্যাক করে লাগল ডিকির মুখে। আর্তনাদ করে মুখ চেপে ধরল ডিকি। তাকাল না কিশোর। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যেতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

'ধরো ওদের! ধরো না, পালিয়ে যাচ্ছে তো!' দরজার কাছ থেকে বলল টম।

ল্যান্ডিং দিয়ে আসার সময় জুবেরের চিৎকার আর দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনতে পেল তিন গোয়েন্দা। সোজা এসে ঢুকে পড়ল মুসার শোবার ঘরে।

দরজায় তালা লাগিয়ে দিল মুসা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল তিনজনে।

'নেংটি ইঁদুরের দল!' বিড়বিড় করে গাল দিল মুসা। 'আবার এসেছে। একবার চুরি করে গিয়েও শান্তি হয়নি।'

'একবারে তো আর সব নিতে পারেনি,' রবিন বলল। 'দামী দামী জিনিস দেখে গেছে। লোভ কি আর সামলাতে পারে।...আগে বলোনি কেন আমাকে? আজ সকালে তাহলে কোনমতেই আমাকে তুলে আনতে পারত না টম।'

'কতবার সাবধান করতে চেয়েছি তোমাকে,' মুসা বলল। 'তুমি তো আমাদের কথা শুনতেই চাওনি। জাদু করেছিল নাকি তোমাকে ওরা?'

'কি করেছিল জানি না। তবে কিছু একটা করেছিল...সম্মোহন-টম্মোহন কোন কিছু; কোল্ড ড্রিংকসের সঙ্গে মিশিয়ে কোন ধরনের ওষুধও খাইয়ে থাকতে পারে।...মোট কথা, টমের মা'টার কাছে কিছুক্ষণ থাকলেই মাথার

মধ্যে কেমন যেন হয়ে যেত আমার...'

'কেন করল?'

'তা তো জানি না!'

'রকি বীচের মানুষ সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার জন্যেই নিশ্চয় তোমার সাথে খাতির করেছিল টম,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া আমাদের কথাও হয়তো শুনে থাকবে। ঘন ঘন চুরিদারি হতে থাকলে তদন্ত করতে পারি আমরা—ওদের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমাকে হাত করে আমাদের দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল।'

'হ্যাঁ, হতে পারে।...যাই হোক, আমাকে স্কুলে না যেতে দেখে তোমরা খোঁজ নাওনি? আমাকে ছাড়াই ফ্লোট ছেড়ে দিয়েছে?'

'ফ্লোটে তোমার জায়গায় আরেকজন চড়ে বসে আছে,' জবাব দিল কিশোর।

'মানে!' বুঝতে পারছে না রবিন।

মুসাও তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।

'টমের মা, সারালিন জুবের,' কিশোর বলল। 'সবার অলক্ষে কোন এক ফাঁকে স্কুলে ঢুকে তোমার পোশাকটা পরে ফেলেছে। তোমার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা কাউকে বুঝতে দিতে চায়নি, বিশেষ করে আমাকে আর মুসাকে।...কিন্তু আমাদের ধরে আনল কেন ওরা? কি করতে চেয়েছিল আমাদের নিয়ে?'

'টমের বাবাকে স্পেনে চলে যাওয়ার কথা বলতে শুনেছি,' রবিন বলল। 'ওরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, তোমরা ওদের সন্দেহ করেছ। ওদের কাজে বাধা দিতে পারো। তাই কোথাও আটকে রেখে নিরাপদে কাজ সেরে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।'

'চোরের গোষ্ঠী চোর! শয়তানের দল!' আবার গাল দিল মুসা। 'আটকে রাখত না মেরে ফেলত কে জানে। মেরে ফেলাটাই ছিল ওদের জন্যে নিরাপদ...'

দরজা ধাক্কানোর শব্দ কানে আসছে।

'বেরোও! বেরিয়ে এসো!' কন ডিকির গলা। 'তাহলে আর কিছু বলব না।'

'তা তো বটেই,' ব্যঙ্গ করে জবাব দিল রবিন। 'আরও তোমাদের বিশ্বাস করি!'

আবার ধাক্কাধাক্কি শুরু করল ডিকি। মিসেস আমানের বেডরুমে চেঁচামেচি করছে মার্ক জুবের। এখনও বেরোতে পারেনি।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কি করব?'

'এখানেই বসে থাকব। যত ধাক্কাধাক্কিই করুক, ঢুকতে পারবে না ওরা। জুবেরকে না বের করা পর্যন্ত যেতেও চাইবে না। ততক্ষণে পুলিশ চলে আসবে।'

'সত্যি ঢুকতে পারবে না?' সন্দেহ যাচ্ছে না রবিনের।

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন ঘন ঘন লাথি পড়তে লাগল দরজায়। তারপর অন্য ধরনের একটা শব্দ। ধারাল কিছু দিয়ে কোপ মারা হচ্ছে মনে হলো। কুড়াল না তো!

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এবার সত্যি সত্যি ভেঙে ফেলবে!'

'থাকা যাবে না এখানে,' রবিন বলল। 'পালানো দরকার।'

জানালার দিকে তাকাল কিশোর, 'ওদিক দিয়ে বেরোনো যায় না?'

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল তিনজনে। বাগানের দিকে তাকাল। মসৃণ, সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগানটা অনেক নিচে মনে হলো।

'কত আর হবে?' আন্দাজ করল রবিন। 'বারো-চোদ্দ ফুট? লাফিয়ে নামা যাবে। কি বলো?'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'আমি পারব না।'

মাথা কাত করল মুসা। 'না পারার কি হলো?'

'আমার ভারী শরীর...'

'ওতে কিছু হবে না। নিচে মাটি নরম। এসো, দেখো, কিছুই হবে না।'

'তোমরা যাও। আমি আসছি।'

দৌড়ে দরজার কাছে চলে এল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'অ্যাই, কোপাকুপির দরকার নেই। দরজাটা নষ্ট কোরো না। খুলছি।' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। জানালার পাল্লা খুলে ফেলেছে মুসা। চৌকাঠে উঠে বসেছে। 'ইয়া আলী!' বলে চিৎকার করে উঠে ব্যাঙের মত ঝাঁপ দিল সে।

মুসা অদৃশ্য হয়ে যেতেই চৌকাঠে উঠে বসল রবিন।

দরজার দিকে ঘুরল আবার কিশোর।

'সত্যি বেরোচ্ছ তো?' অন্যপাশ থেকে কথা শোনা গেল। ডিকি নয়, মার্ক জুবেরের কণ্ঠ। ওকে মুক্ত করে ফেলেছে।

'হ্যাঁ। চাবিটা আটকে গেছে। ঘুরছে না। একটু দাঁড়ান।' চেয়ার-টেবিল সব তুলে এনে দরজায় ঠেস দিল কিশোর। তার ওপর চাপিয়ে দিল ভারী ভারী জিনিস। তারপর ছুটে এল জানালার কাছে।

রবিনও নেমে গেছে। নিচে উঁকি দিল কিশোর। মুখ তুলে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে দু'জনে। ও তাকাতেই তাড়াতাড়ি নামতে ইশারা করল।

চৌকাঠে উঠে বসল সে। চোখ বন্ধ করে দিল লাফ। কানের কাছে বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ শুনল। পা দুটো ঠেকল মাটিতে।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। হ্যাঁক করে উঠল বুকের মধ্যে কোথায় যেন। সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল হাঁ করা মুখ থেকে।

একপাশ থেকে ধরে তাকে টেনে তুলল মুসা। 'ব্যথা পেয়েছ?'

নীরবে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল কিশোর।

বাড়ির সামনের গেটের দিকে দৌড় দিল ওরা।

ড্রাইভওয়েতে এসে গাড়িতে কাউকে না দেখে ছুটে গেল রবিন। ইগনিশন থেকে টান দিয়ে চাবিটা খুলে নিল।

ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। কোন্‌দিকে যাবে ভাবছে, এই

সময় কানে এল সাইরেনের শব্দ।

পুলিশের সাইরেন!

'যাক, বিড তাহলে খবরটা দিয়েছে!' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কিশোর।

বাড়ির দিকে ফিরে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তিনজনে। টম, জুবের কিংবা ডিকি বেরোয় কিনা, পাহারা দিতে লাগল।

বেরোল না কেউ।

গেটের কাছে পৌঁছে গেল পুলিশের গাড়ির বহর। চারটে গাড়ি এসেছে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল সামনের গাড়িটা। লাফিয়ে নামল একজন অফিসার। চোরেরা কোথায় আছে জানাল তাকে কিশোর।

পুলিশের সঙ্গে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। এত পুলিশ দেখে বিশেষ বাধাটাধা দিল না আর জুবের। তার দেখাদেখি কন ডিকিও চুপ করে রইল। দু'জনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো।

কিন্তু টম কোথায়? পুলিশের সাইরেন শুনেই নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।

হলঘরের খোলা জানালাটার দিকে চোখ পড়তেই বুঝে ফেলল কিশোর, কোন্‌দিকে গেছে টম। দৌড় দিল সেদিকে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে বাইরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে! চলে যাচ্ছে!'

আধডজন পুলিশ পিছু নিল টমের।

'কিশোর, দেখো কে এসেছেন,' দরজা খুলে দিয়ে বললেন মিসেস আমান।

হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।

মুসাদের বাড়ির হলরুমে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। আরও অনেক ছেলেমেয়ে উপস্থিত। ফেসটিভ্যাল উৎসবের কয়েক দিন পর মুসাদের বাড়িতে জমায়েত হয়েছে ওরা। শুধু ছোটদের জন্যে আরেকটা পার্টি দিচ্ছেন মুসার আম্মা। বাড়িতে চুরি ঠেকানোর আনন্দে।

লাইব্রেরি থেকে ম্যাজিকের ওপর বই এনে গবেষণা করেছে কিশোর। সে, মুসা আর রবিন মিলে বেশ কিছু হাত সাফাইয়ের প্র্যাকটিস করেছে। মানুষ গায়েব করার খেলা দেখানোর জন্যে যে ধরনের বাক্স ব্যবহার করেছিল গ্রেট মিসটিরিয়োসো, ওরকম একটা বাক্সও জোগাড় করেছে। পার্টিতে খেলা দেখাবে তিন গোয়েন্দা ওরফে তিন কিশোর জাদুকর।

হই-চই করছে উত্তেজিত কিশোর-কিশোরীরা। ইয়ান ফ্লেচারের আগমনে সামান্য স্তিমিত হলো।

'ভাবলাম,' এগিয়ে এসে তিন গোয়েন্দার উদ্দেশে বললেন তিনি, 'চুরির কেসের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে জানতে চাইবে তোমরা। মিসেস পাশাকে ফোন করে তোমাকে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, এখানে আছ। মিসেস আমানকে ফোন করলাম। তিনি পার্টির দাওয়াতই দিয়ে বসলেন।'

একটা চেয়ার এগিয়ে দিল মুসা।

'থ্যাংকিউ,' বলে তাতে বসলেন ক্যাপ্টেন। কিশোরের দিকে তাকালেন, 'কিশোর, তোমার ধারণাই ঠিক। এখানে আসার আগে রিয়ারসাইড কাউন্টিতে ছিল জুবেররা। ডিকিও থাকত ওদের সঙ্গে। সে সারালিনের ভাই। ওখানেও লোক ঠকিয়ে, চুরিদারি করে শেষে আর টিকতে না পেরে পালিয়ে এসেছে রকি বীচে। ওখানকার পুলিশ ওদের খুঁজছে। এখানে এসেও সেই একই খেলা জুড়েছিল। ম্যাজিক শো কিংবা ফেইথ হীলিঙের মীটিং করার সময় কায়দা করে লোকের বাড়ির চাবির ছাপ রেখে দিত। পরে ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে রাতে যেত চুরি করতে। এটাই ওদের পেশা। অনেক শহরে এ কাজ করেছে, ধরা পড়েনি। লোকের সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এসেছে।'

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'রকি বীচে আসাটা উচিত হয়নি ওদের। তিন গোয়েন্দার খপ্পরে পড়লে যে মুক্তি পাবে না জানলে আর আসত না।'

'টমের বাড়াবাড়ির জন্যেই আসলে ধরাটা পড়ল,' কিশোর বলল। 'নিজেকে অতি বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে গিয়ে নানা রকম সূত্র তুলে দিতে লাগল আমাদের হাতে।'

'মিথ্যে কথা বলতে গিয়েই প্রথম সন্দেহটা জাগাল আমাদের,' মুসা বলল।

'মিথ্যে কথা বলে, ফাঁকিবাজি করে আর কদ্দিন,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'ধরা ওদের পড়তেই হত। এখানে না হলেও অন্য কোনখানে...যাকগে, মিসেস আমান বললেন তোমরা নাকি একটা ম্যাজিক শো'র ব্যবস্থা করেছ?'

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তবে ভয় নেই। কারও কাছে চাবি চাইতে যাব না আমরা।'

'সে তো জানিই,' হাসতে হাসতে বললেন ক্যাপ্টেন।

'খেলাটা কি দেখতে চান?' মুসা বলল, 'গ্রেট মিসটিরিয়োসো যে ভাবে মানুষ উধাও করে দিত, আমরাও সেটা শিখেছি।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'দেরি কেন? শুরু করে দিতে পারি, কি বলো?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'হ্যাঁ।' নাটকীয় ভঙ্গিতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'প্রিয় বন্ধুরা, চুপ করো, আমাদের শো এখন শুরু হতে যাচ্ছে। দয়া করে যার যার চেয়ারে বসে পড়ো।'

বসে পড়ল সবাই। সব আলো নিভিয়ে দেয়া হলো। ঘর অন্ধকার। কয়েক মিনিট পর জ্বলে উঠল পর্দার ওপরের বাতিটা। গোল আলো ফেলতে থাকল নিচের মেঝেতে রাখা ম্যাজিক বক্সের ওপর।

বুম করে পটকা ফোটার মত শব্দ হলো। রঙিন ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গ্রেট মুসাইয়োসো ওরফে মুসা আমান। তার সহকারী রবিন মিলফোর্ড। পয়সা উধাও করা আর বল লোফালুফি করে দর্শকদের করতালি পাবার পর বিণীত ভঙ্গিতে সরে দাঁড়াল একপাশে।

মানুষ উধাও করে দেবার ঘোষণা দিল তখন মুসা। ভারী কণ্ঠে বলল, 'প্রিয় বন্ধুরা, এবার তোমরা দেখতে পাবে শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর জাদু, গ্রেট মুসাইয়োসোর মানুষ উধাওয়ের খেলা। এই যে বাক্সটা দেখছ, এর মধ্যে

তোমাদের যে কাউকে ঢুকিয়ে নিয়ে জাদুর সাহায্যে আমি গায়েব করে দিতে পারি। বিশ্বাস না হয়, এসে বাক্সে ঢুকে প্রমাণ করতে পারো। তবে বুঝেশুনে আসবে। যদি কিছু ঘটে যায় আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

কিন্তু কেউ অবিশ্বাসী হয়ে প্রমাণ করতে আসতে রাজি হলো না। কে যায় বাক্সে ঢুকে চিরকালের জন্যে গায়েব হতে। পেশাদার ম্যাজিশিয়ান নয় মুসা। যদি গায়েব করে দিয়ে আর বাতাস থেকে ফেরত আনতে না পারে!

আগ্রহী কাউকে না পেয়ে শেষে রবিনকে অনুরোধ করল মুসা, 'রবিন, তুমি ঢুকবে?'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে শেষে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো রবিন। ঘাড় কাত করে বলল, 'ঠিক আছে। তবে গায়েব করার পর ফিরিয়ে আনতে পারবে তো?'

হেহ্ হেহ্ করে খাঁটি জাদুকরি ভঙ্গিতে হাসল মুসা। 'গ্রেট মুসাইয়োসোর ওপর তোমারও অবিশ্বাস? নাও, দেরি কোরো না আর। নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ো।'

বাক্সের ডালা তুলে ধরে রাখল মুসা। রবিন ঢোকার পর ডালা নামিয়ে তালা লাগিয়ে দিল। চাবিটা রাখল পকেটে।

ঘরে পিনপতন নীরবতা। চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার ভঙ্গি করল মুসা। পকেট থেকে ছোট গোল একটা জিনিস বের করে আছাড় মারল। পটকা ফোটার শব্দ হলো। রঙিন ধোঁয়ায় ভরে গেল বাক্সের আশেপাশের খানিকটা জায়গা।

ধোঁয়া সরে গেলে কৌতূহলী দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ভাবগম্ভীর স্বরে বলতে লাগল মুসা, 'প্রিয় বন্ধুরা, রবিনকে গায়েব করে দিয়েছি আমি। বিশ্বাস না হলে, এসো, দেখে যাও বাক্সের মধ্যে কিছু নেই।'

গুঞ্জন করে উঠল দর্শকরা। উঠে এল কয়েকজন। বাক্স ঘিরে দাঁড়াল।

হাসিমুখে পকেটে হাত দিল মুসা। বের করে আনল চাবিটা। ধীরে সুস্থে তালা খুলে সরে দাঁড়াল। বলল, 'নাও, নিজেরাই তুলে দেখো।'

ডালা তুলল একটা ছেলে। চিৎকার করে উঠল।

মুখ কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে এল রবিন।

চেঁচামেচি শুরু করল দর্শকরা :

আহা, কি জাদুরে!

কই, গেল না তো!

ম্যাজিক জানে না, কচু!

পুরো একটা মিনিট বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। তারপর ফেটে পড়ল রবিনের দিকে তাকিয়ে, 'গেলে না কেন!'

সমান তেজে জবাব দিল রবিন, 'কি করে যাব? ঝাঁপির লক তো লাগানো। খুলেছিলে ওটা?'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল মুসা। বসে পড়তে গেল বাক্সের ওপর। ডালাটা যে খোলা, খেয়াল করল না। পড়ে গেল ভেতরে। শরীরের পেছনটা

কোমর সহ বাক্সের মধ্যে ঢুকে গিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঁচু হয়ে রইল চার হাত-পা। কেউ টেনে না তুললে উঠে আসা কঠিন হবে।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল ছেলেমেয়ের দল।

গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন, 'ম্যাজিক দেখানো সহজ নয়!'

ভারী ভারী কথা বলে চাপতে চেয়েছিলেন হাসিটা। পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

***